তত্ত্বজ্ঞান কি করে হবে?

॥ শ্রীহরিঃ ॥

অনুবাদকের কথা

'তত্ত্ব' কথাটি সর্বজনপরিচিত এবং সর্বজনপ্রিয়। তত্ত্ব সম্পর্কে বহু কথা বলা হয়েছে এবং তা বহু চর্চিত। তবু সাধারণ মানুষের কাছে এবং মনে হয় অনেক সাধকদের কাছেও তা এক হেঁয়ালি হয়ে আছে। সাধকরা তো তত্ত্ব-সন্ধানী!

স্বামী রামসুখদাস মহারাজ বর্তমান যুগের পরমার্থ পথের একজন দিশারী। স্বামীজী প্রণীত গীতার বিস্তৃত টীকা **'সাধক-সঞ্জীবনী'** এবং **'গীতা দর্পণ'** গ্রন্থ দুটি সাধারণ মানুষকেও গীতার প্রতি আকৃষ্ট করে। বহু শাস্ত্র তিনি অধ্যয়ন করেছেন এবং জনসাধারণের মধ্যে সেগুলির সার অনুপম ভঙ্গীতে প্রকাশ করেছেন। তাঁর বই পড়লে বোঝা যায় যে তাঁর লেখাগুলিতে শব্দাড়ম্বর না থাকলেও দুরূহ বিষয়ের সরলীকৃত ব্যাখ্যা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বর্তমান গ্রন্থটি মূলতঃ তত্ত্বসন্ধানী সাধকদের উদ্দেশ্যে লিখিত। তবু নিঃসন্দেহে বলা যায় যে জিজ্ঞাসু সকল মানুষই এটি পাঠ করে লাভবান হবেন। একথা বলা বাহুল্য যে বাংলা ভাষার ধর্ম পুস্তকে এটি এক অভিনব সংযোজন। এমন একটি বইয়ের অনুবাদে যুক্ত হয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি।

ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

॥ শ্রীহরিঃ ॥

সূচীপত্র

❀ ❀ ❀

(১) তত্ত্বজ্ঞানের সহজ উপায়

আমাদের স্বরূপ চিন্ময় সত্তামাত্র আর তাতে অহং নেই—এই কথা যদি ঠিকমতো অনুভূত হয় তাহলে তৎকালেই জীবন্মুক্তি হয়ে যায়। এতে সময় লাগে না। সময় তো তাতে লাগে যা এখন নেই এবং যাকে নির্মাণ করতে হয়। যা এখন বর্তমান তাকে নির্মাণ করতে হয় না, তার দিকে দৃষ্টি দিতে হয়, তাকে স্বীকার করে নিতে হয়। যেমন—

সংকর সহজ সরূপ সম্‌হারা। লাগি সমাধি অখন্ড অপারা।।

(রামচরিতমানস. বালকাণ্ড ৫৮/৪)

দুটি অক্ষর—'আমি হই'। এর মধ্যে 'আমি' প্রকৃতির অংশ এবং 'হই' পরমাত্মার অংশ। 'আমি' জড় এবং 'হই' চেতন। 'আমি' আধেয় এবং 'হই' আধার। 'আমি' প্রকাশ্য এবং 'হই' প্রকাশক। 'আমি' পরিবর্তনশীল এবং 'হই' অপরিবর্তনীয়। 'আমি' অনিত্য এবং 'হই' নিত্য। 'আমি' বিকারী এবং 'হই' নির্বিকার। 'আমি' এবং 'হই'-কে এক মনে করা হয়েছে—এটি চিজ্জড়গ্রন্থি, জড়-চেতনের গ্রন্থি। এইটি বন্ধন, এইটি অজ্ঞান। 'আমি' এবং 'হই'-কে আলাদাভাবে অনুভব করা হলো মুক্তি, তত্ত্ববোধ। এখানে এটি জেনে নেওয়া আবশ্যক যে 'আমি'-কে সঙ্গে জুড়ে দিলেই 'হই' বলা হয়। যদি 'আমি'-র সঙ্গে জোড়া না হয় তাহলে 'হই' থাকবে না, তখন 'হয়' থাকবে। ঐ 'হয়' হলো নিজের স্বরূপ।

একই মানুষ তার বাবার কাছে বলে 'আমি হলাম ছেলে', ছেলের কাছে বলে 'আমি হলাম বাবা', দাদুর সামনে বলে, 'আমি হলাম নাতি', নাতিকে বলে 'আমি হলাম দাদু', বোনকে বলে, 'আমি হলাম ভাই' স্ত্রীকে বলে, 'আমি হলাম স্বামী'। ভাগ্নেকে বলে 'আমি হলাম মামা', মামাকে বলে 'আমি হলাম ভাগ্নে' ইত্যাদি। তাৎপর্য হলো এই যে বাবা, ছেলে, দাদু, নাতি, ভাই, স্বামী, মামা, ভাগ্নে প্রভৃতি তো ভিন্ন, কিন্তু

'হলাম' সর্বত্রই এক। আমি বদলেছে, কিন্তু 'হলাম' বদলায় নি। সেই 'আমি' বাবার কাছে ছেলে এবং ছেলের কাছে বাবা হয়ে যায়। অর্থাৎ সে যার কাছে যায় সেই রকম হয়ে যায়। যদি তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় 'তুমি কে?'—তো সে নিজেই তা জানে না। যদি 'আমি'-কে খোঁজো তো 'আমি' কে পাবে না, কিন্তু সত্তাকে পাবে। কারণ বাস্তবে 'আছে'-র সত্তা আছে, 'আমি'-র কোনো সত্তা নেই।

ছেলের খাতিরে বাবা এবং বাবার খাতিরে ছেলে—এইভাবে ছেলে, বাবা, নাতি, দাদু প্রভৃতি নামের খাতিরে (সাপেক্ষে) হয়ে থাকে; এগুলি স্বয়ং কোনো নাম নয়। স্বয়ং-এর নাম হলো নিরপেক্ষ—'আছে'। সেই 'আছে' 'আমি'-কে জানে। 'আমি'-র দ্বারা জানা যায় না এবং যাঁর দ্বারা জানা যায়, তা 'আমি' নয়। 'আমি' হলো জ্ঞেয় (যাকে জানা হয়) এবং 'আছে' হলো জ্ঞাতা (যে জানে)। 'আমি' পরিচ্ছিন্ন এবং তাকে যে জানে সেই 'আছে' অপরিচ্ছিন্ন। 'আমি'-র সঙ্গে সম্বন্ধ মানুন আর নাই মানুন, 'আমি'-র কোনো সত্তা নেই। একমাত্র সত্তা হলো 'আছে'-রই। পরিবর্তন হয় 'আমি'-তে, 'আছে'-তে হয় না। 'আছি'-ও বাস্তবে 'আছে'-রই অংশ। 'আমি'-ত্বকে ধরলেই সেই অংশ। যদি 'আমি'-ভাবকে না ধরেন তাহলে সে অংশ 'আছি' নয় বরং তাহলো 'আছে' (সত্তামাত্র)। 'আমি' অহংভাব এবং 'আমার বাবা', 'আমার ছেলে' প্রভৃতি হলো মমত্ব-ভাব। অহং এবং মমত্ব-ভাব থেকে ত্রাণ পেলেই মুক্তি।

নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি।।

(গীতা ২/৭১)

এটি 'ব্রাহ্মী স্থিতি'।* এই ব্রাহ্মী স্থিতিকে লাভ করার পর অর্থাৎ 'অস্তি'-তে স্থিতি অনুভব করার পর শরীরের কেউ মালিক থাকে না অর্থাৎ শরীরকে 'আমি-আমার' বলার আর কেউ থাকে না।

---

*এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি।। (গীতা ২/৭২)
'হে পার্থ! এইটিই ব্রাহ্মী স্থিতি। এটিকে লাভ করে কেউ কখনও মোহিত হয় না। এই স্থিতিতে যদি অন্তিম কালেও স্থিত হওয়া যায় তাহলে নির্বাণ (শান্ত) ব্রহ্ম লাভ হয়।'

মানুষ, পশু, পাখি, ইট. চুন, পাথর—এইভাবে নানারকম বস্তুর মধ্যে প্রভেদ রয়েছে, কিন্তু 'অস্তি'-র মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। অনুরূপ, আমি মানুষ, আমি দেবতা, আমি পশু, আমি পাখি—এইভাবে মানুষ প্রভৃতি নানা যোনির পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু স্বয়ং-এর কোনো পরিবর্তন হয়নি। সকল শরীরে, সব রকম অবস্থায় চিন্ময় সত্তা সেই একই। বালক, যুবক, বৃদ্ধ—এই তিনটি এক নয়, কিন্তু এই তিনটি অবস্থাতেই সত্তা এক। কুমারী, সধবা এবং বিধবা—এই তিনটি এক নয় কিন্তু এই তিনটিতেই সত্তা এক। জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, মূর্ছা এবং সমাধি—এই পাঁচটি অবস্থাও এক নয়। কিন্তু এই পাঁচটিতেও সত্তা সেই এক। অবস্থার পরিবর্তন হয়, কিন্তু তাকে যে জানে তার পরিবর্তন হয় না। এইভাবে মূঢ়, ক্ষিপ্র, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র এবং নিরুদ্ধ—এই পাঁচটি বৃত্তির মধ্যেও প্রভেদ আছে। কিন্তু এদের যে জানে তার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। যে জানে তারও যদি পরিবর্তন হয়ে যায় তাহলে এই পাঁচটিকে কে গণনা করবে? একটি মার্মিক কথা হলো এই যে, সব কিছুর পরিবর্তনের জ্ঞান হয়ে থাকে, কিন্তু স্বয়ং-এর পরিবর্তনের জ্ঞান কখনও কারও হয় না। 'এই'—বোধের দ্বারা সব কিছুর আভাস মেলে, কিন্তু নিজের স্বরূপের আভাস 'এই'—ভাবের দ্বারা কারও হয় না। সব কিছুর অবিদ্যমানতা জানা যায়, কিন্তু নিজের অবিদ্যমানের জ্ঞান কারোরও কখনও হয় না। তাৎপর্য হলো 'অস্তি' (সত্তা)-তে আমাদের স্থিতি স্বাভাবিক, তার জন্য কিছু করতে হয় না। ভুল যা হয় তা হলো এই যে, আমরা 'সংসার বিদ্যমান', এইভাবে 'নাস্তি'-তে 'অস্তি' আরোপ করে থাকি। 'নাস্তি'-তে 'অস্তি' আরোপ করার ফলে 'নাস্তি' (সংসার)-এর সত্তা দৃষ্ট হয় এবং 'অস্তি'-র দিকে দৃষ্টি যায় না। বাস্তবে যেভাবে আমরা 'নাস্তি' সংসারকে 'অস্তি' রূপে দেখি, সেইভাবে 'নাস্তি'-র মধ্যে 'অস্তি'-কে উপলব্ধি করতে হবে। 'নাস্তি'র মধ্যে 'অস্তি'-কে উপলব্ধি করলে 'নাস্তি' থাকবে না 'অস্তি' থেকে যাবে।

ভগবান বলেছেন—

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।

(গীতা ২/১৬)

'অ-সতের সত্তা বিদ্যমান নেই অর্থাৎ অ-সতের অবিদ্যমানতাই বর্তমান এবং সৎ-এর অবিদ্যমানতা বর্তমান নেই, অর্থাৎ সৎ-এর ভাব বিদ্যমান।'

একই স্থান, কাল, বস্তু, ব্যক্তি, অবস্থা, পরিস্থিতি প্রভৃতিতে নিজের যে পরিচ্ছিন্ন সত্তা দেখা যায় তা অহং (ব্যক্তিত্ব, একদর্শীতা)-কে নিয়েই দেখা যায়। যতক্ষণ অহং থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ নিজেকে একটি স্থান, কাল প্রভৃতিতে দেখে। অহং দূর হয়ে গেলে দেশ, কাল প্রভৃতিতে পরিচ্ছিন্ন সত্তা থাকে না, বরং অপরিচ্ছিন্ন সত্তাই থেকে যায়।

বাস্তবে অহং-ই নেই, আছে কেবল তার স্বীকৃতি। সাংসারিক বস্তুগুলির মধ্যে যেমন সত্তা প্রতীত হয় সেই রকম সত্তাও অহং-এ নেই। সাংসারিক বস্তুর তো উৎপত্তি ও বিনাশ হয়। কিন্তু অহং সৃষ্টি ও বিনাশশীলও নয়। এই জন্য তত্ত্ববোধ হয়ে গেলে শরীরাদি পদার্থ তো থাকে কিন্তু অহং দূর হয়ে যায়। অতএব তত্ত্ববোধ হলে জ্ঞানী থাকে না, জ্ঞান থাকে। আজ পর্যন্ত কেউ জ্ঞানী হয় নি, কেউ জ্ঞানী নেই এবং কেউ জ্ঞানী হবে না, জ্ঞানী হওয়া সম্ভবও নয়। অহং হয় জ্ঞানীতে, জ্ঞানে নয়। অতএব জ্ঞানী নেই, কেবল জ্ঞান আছে, সত্তা আছে। সেই জ্ঞানের কোনো জ্ঞাতা নেই, কোনো ধর্মী নেই, নেই কোনো মালিক, তার কারণ ঐ জ্ঞান স্ব-প্রকাশ; তাই স্বয়ং-এর দ্বারাই স্বয়ং-এর জ্ঞান হয়। বাস্তবে জ্ঞান হয় না, অজ্ঞানতা দূর হয়ে যায়। অজ্ঞানতা দূর হওয়াকেই তত্ত্বজ্ঞান হওয়া বলা হয়।

একটি হলো প্রকাশ্য (সংসার) আর অন্যটি হলো প্রকাশক (পরমাত্মা)। অথবা একটি হলো 'ইহা' আর অন্যটি হলো তার আধার, প্রকাশক, অধিষ্ঠান, 'সত্তা'। অহং প্রকাশ্যেও (ইহা) নেই এবং প্রকাশক (সত্তা)-তেও নেই। তাকে কেবল মেনে নেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে সংসার (ইহা)-এর ইচ্ছাও থাকে আবার পরমাত্মা (সত্তা)-র ইচ্ছাও থাকে তারই নাম অহং, সেইটিই হলো 'জীব'। তাৎপর্য হলো জড়ের সম্বন্ধ থেকেই সংসারের জন্য আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ 'ভোগেচ্ছা' জন্মায় এবং চেতনার সঙ্গে সম্বন্ধ হলে পরমাত্মার জন্য আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ 'জিজ্ঞাসা' জন্মায়। অতএব অহং (জড়-চেতনের গ্রন্থি)-এতে জড়

অংশের প্রাধান্যের ফলে আমরা সংসারকে চাই এবং চেতন অংশের প্রাধান্যের ফলে আমরা পরমাত্মাকে চাই।* মেনে নেওয়া এই অহং-এর বিনাশ হলে ভোগেচ্ছা দূর হয়ে যায় এবং জিজ্ঞাসার সমাধান হয়ে যায়। অর্থাৎ তত্ত্ব থেকে যায়। বাস্তবে পরমাত্মার ইচ্ছাও সংসারের জন্য ইচ্ছার কারণেই হয়। সংসারের ইচ্ছা না থাকলে তত্ত্বজ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ হয়ে যায়।

সাধনার উচ্চ অবস্থায় 'আমার তত্ত্বজ্ঞান হোক, আমি মুক্ত হয়ে যাই'—এই ইচ্ছাও বাধা। যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তঃকরণে অ-সতের সত্তা দৃঢ় থাকে ততক্ষণ জিজ্ঞাসা সহায়ক হয়, কিন্তু অ-সতের সত্তা শিথিল হয়ে গেলে জিজ্ঞাসাও তত্ত্বজ্ঞানের পক্ষে বাধা হয়ে পড়ে। তৃষ্ণা যেমন জল থেকে তার অন্তর প্রমাণ করে তেমনই জিজ্ঞাসাও তত্ত্ব থেকে তার অন্তর প্রমাণ করে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তত্ত্ব দূরস্থ নয়, তা নিত্যপ্রাপ্ত। দ্বিতীয় কথা, তত্ত্বজ্ঞানের ইচ্ছার ফলে ব্যক্তিত্ব (অহং) দৃঢ় হয়ে যায়, এটি তত্ত্বজ্ঞানের পক্ষে বাধা। বাস্তবে তত্ত্বজ্ঞান, মুক্তি স্বতঃসিদ্ধ। তত্ত্বজ্ঞানের জন্য ইচ্ছা করে আমরা অজ্ঞানকে স্বত্তা দিই, নিজেদের মধ্যে অজ্ঞানকে মান্যতা দিই, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞানের তো কোনো সত্তাই নেই। তাই তত্ত্বজ্ঞান হয়ে গেলে আর মোহ থাকে না—'যজ্জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহম্' (গীতা ৪/৩৫); কেননা বাস্তবে মোহই নেই। যা নেই তাই দূর হয়, আর যা আছে তাকেই পাওয়া যায়।

সাধকের যখন স্বতঃস্বাভাবিক একমাত্র 'অস্তি' (সত্তা) উপলব্ধ হয় তখন তাকেই বলা হয় জীবন্মুক্তি, তত্ত্ববোধ। তার কারণ হলো, শেষ পর্যন্ত সবকিছুর নিষেধ হওয়ায় এক 'অস্তি'-ই অবশিষ্ট থাকে। সেই

*আমি যেন চিরকাল বেঁচে থাকি, কখনও মৃত্যু না হয়—এটি হলো 'সৎ'-এর ইচ্ছা; আমি সব কিছু জেনে নিই, কখনও অজ্ঞানী না থাকি—এটি হলো 'চিৎ'-এর ইচ্ছা আর সর্বদা সুখী থাকি, কখন দুঃখিত যেন না হই, এটি হলো 'আনন্দ'-এর ইচ্ছা। এইভাবে সকল জীবের মধ্যে সৎ-চিৎ-আনন্দরূপ পরমাত্মার জন্য ইচ্ছা থাকে। কিন্তু জড়ের সঙ্গে সম্বন্ধ মেনে নেওয়ার কারণে তারা যে ভুলটি করে তা হলো—এই ইচ্ছাগুলিকে বিনাশশীল সংসারের মধ্যেই পূর্ণ করতে চায়। তারা শরীরকে নিয়ে বেঁচে থাকতে চায়, বুদ্ধিকে নিয়ে জ্ঞাতা হতে চায় এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ে সুখী হতে চায়।

'অস্তি'-র প্রত্যাশী 'নাস্তি' এবং 'অস্তি' দুটি থেকেই বিমুক্ত অর্থাৎ সেই সত্তাতে 'নাস্তি'-ও নেই, 'অস্তি'-ও নেই। সেই সত্তা জ্ঞানস্বরূপ, চিন্ময়মাত্র। সেই সত্তা নিত্য জাগ্রত থাকে। সুষুপ্তিতে অহংসহ সমস্ত করণ বিলীন হয়ে যায়, কিন্তু নিজের সত্তা বিলীন হয় না। এটি সত্তার নিত্যজাগৃতি। সেই সত্তা কখনও পুরাতন হয় না, বরং নিত্য নতুন থেকে যায়, কেননা তাতে 'কাল' নেই। সেই সত্তার সম্পর্কে জ্ঞান হওয়াই হলো তত্ত্বজ্ঞান এবং সত্তার সঙ্গে কিছু জুড়ে দেওয়া হলো অজ্ঞান।

(২) তত্ত্বজ্ঞান কী?

(আত্মজ্ঞান তথা পরমাত্মজ্ঞান)

তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার পথে দুটি প্রধান বাধা—মোহ এবং শাস্ত্রীয় মতভেদ। গীতাতে আছে—

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ।।
শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি।।

(গীতা ২/৫২-৫৩)

'যখন তোমার বুদ্ধি মোহরূপী পঙ্ককে পার করে যাবে, সেই সময় তুমি যত ভোগের কথা শুনেছ এবং পরে শুনবে সেগুলির সম্পর্কে বৈরাগ্য প্রাপ্ত করবে।'

'যখন শাস্ত্রীয় মতভেদের দ্বারা বিচলিত তোমার বুদ্ধি নিশ্চল হয়ে যাবে এবং পরমাত্মাতে অচল হয়ে যাবে—সেই সময় তুমি যোগকে লাভ করবে।'

অজ্ঞান, অবিবেককে 'মোহ' বলা হয়। অবিবেকের অর্থ বিবেকের অবিদ্যমানতা নয়, তা হলো বিবেককে সমাদর না করা। অতএব বিবেককে শ্রদ্ধা না করা, তাকে গুরুত্ব না দেওয়া,তার দিকে দৃষ্টি না দেওয়া হলো 'অবিবেক'। বিবেক স্বতঃসিদ্ধ। বিবেকজ্ঞান হলো সাধন এবং তত্ত্বজ্ঞান হলো সাধ্য। যেমন সাধ্যরূপ তত্ত্বজ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ, তেমনই সাধনরূপ বিবেকজ্ঞানও স্বতঃসিদ্ধ।

অজ্ঞানতার চিহ্ন 'অনুরাগ'—**রাগো লিঙ্গমবোধস্য চিত্তব্যায়ামভূমিষু।** শরীর, ধন-সম্পত্তি, পরিবার, মান-সম্মান প্রভৃতি কোনোটির প্রতি অনুরাগ জন্মান হলো অজ্ঞানতা, মোহের লক্ষণ। যতটা অনুরাগ, মোহও ততটা; ততটাই অজ্ঞানতা; মূঢ়তা, ভ্রম, বাধাও ততটাই। এই অনুরাগেরই কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ, মাৎসর্য প্রভৃতি অনেক রূপ।

দ্বিতীয় বাধা—শ্রুতিবিপ্রতিপত্তি অর্থাৎ শাস্ত্রীয় মতভেদ। কেউ বলেন অদ্বৈত, কেউ বলেন দ্বৈত, কেউ বলেন বিশিষ্টাদ্বৈত আবার কেউ বলেন অচিন্ত্যভেদাভেদ। এই রকম অনেক মতভেদ আছে। এই সব মতভেদের কারণে সাধকের বুদ্ধি ভ্রমিত হয়ে যায় এবং তাঁর পক্ষে কোন্ মতটি ঠিক আর কোন্‌টি বেঠিক—তা নিশ্চয় করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে।

এই রকমের মোহ এবং শাস্ত্রীয় মতভেদ অর্থাৎ সাংসারিক মোহ এবং শাস্ত্রীয় মোহ—এই দুটি থেকে মুক্ত হলে তত্ত্বজ্ঞান, নিত্যযোগের উপলব্ধি হয়। উদ্দেশ্য যদি হয় কেবল নিজের কল্যাণ করা এবং টাকা-পয়সা, আত্মীয়-স্বজন কারো সঙ্গে স্বার্থের সম্বন্ধ না থাকে তাহলে আমরা মোহরূপী পঙ্ক থেকে উদ্ধার পাই। উদ্দেশ্য যেন না হয় বই পড়ার, শাস্ত্রীয় কথা শেখার। উদ্দেশ্য যদি হয় তত্ত্বকে বোঝার তাহলে আমরা শ্রুতি- বিপ্রতিপত্তিকে পার করে ফেলব। তাৎপর্য হলো এই যে মোহ কিংবা শাস্ত্রীয় মতভেদ কোনোটিরই প্রাধান্য আমাদের মধ্যে যেন না থাকে। কোনো মত, সম্প্রদায়ের প্রতিও আমাদের আগ্রহ থাকা উচিত নয়।* এতটা হয়ে গেলেই আমরা যোগের, তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হয়ে যাব। এর বেশি কোনো বিশেষ অধিকারের প্রয়োজন নেই। এখন তত্ত্বজ্ঞান কী—সে বিষয়ে আলোচনা করতে হবে।

তত্ত্বজ্ঞান সর্বাপেক্ষা সরল, সহজ এবং সকলের প্রত্যক্ষ অনুভূতির বিষয়। তার মানে এটি অনুভব করতে, বুঝতে এবং পেতে কোনো বাধা নেই। এতে করা, বোঝা এবং পাওয়া প্রযোজ্য হয় না। তার কারণ এটি নিত্য প্রাপ্ত এবং জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি প্রভৃতি সকল অবস্থাতে সর্বদা যেমনকার তেমন একইভাবে থাকে। তত্ত্বজ্ঞান যত প্রত্যক্ষ, এই সংসার কখনও ততটা প্রত্যক্ষ নয়। তাৎপর্য এই যে আমাদের অনুভূতিতে

*নারায়ণ অরু নগরকে, রজ্জব রাহ অনেক।
ভাবে আবো কিধর সে, আগে অস্থল এক।।
পহুঁচে পহুঁচে এক মত, অনপহুঁচে মত ঔর।
সন্তদাস ঘড়ী অরঠ কী, ঢুরে এক হী ঠৌর।।
জব লাগি কাচী খীচড়ী, তব লগি খদবদ হোয়।
সন্তদাস সীজ্যাঁ পছে, খদবদ করৈ ন কোয়।।

তত্ত্বজ্ঞান যতটা স্পষ্ট, সংসার ততটা স্পষ্ট নয়। এই কথাটিকে এইভাবে বোঝা উচিত। জীব অনেক যোনিতে উৎপন্ন হয়। সে কখনও মানুষ হয়ে জন্মায়, কখনও পশু-পাখি হয়ে জন্মায়, কখনও দেবতা হয়ে জন্মায়। কখনও রাক্ষস হয়ে, অসুর হয়ে, কখনও বা ভূত, প্রেত, পিশাচ হয়ে জন্মায়। এতে শরীর এক রকম থাকে না, কিন্তু জীব স্বয়ং সত্তারূপে একই থাকে। স্বভাব এক থাকে না, অভ্যাস এক থাকে না; ভাষা, আচরণ, লোক (স্থান), সময়, কোনোটাই এক রকম থাকে না। সবই কিছু না কিছু বদলে যায় কিন্তু স্বয়ং-এর সত্তা বদলায় না। সত্তা যদি সেই একই না থাকে তাহলে ভিন্ন ভিন্ন নাম, রূপ কে ধারণ করবে? এজন্য গীতায় বলা হয়েছে—

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে। (৮/১৯)

'এই সেই একই প্রাণী বার বার জন্মগ্রহণ করে বিলীন হয়ে যায়।'

যা বার বার জন্মগ্রহণ করে বিলীন হয়ে যায় সেটি হলো শরীর, আর যা সেই একই থেকে যায়, সেটি জীবের আসল স্বরূপ অর্থাৎ চিন্ময় সত্তা (অস্তি)। এটি হলো 'আত্মজ্ঞানের' বর্ণনা। এবার 'পরমাত্মার' বর্ণনা করা যাক। সমগ্র সৃষ্টিতে 'অস্তি'-র মতো কোনো সারবস্তু নেই। লোক-পরলোক, চৌদ্দভুবন, সাতটি দ্বীপ, নটি খণ্ড প্রভৃতি যা কিছু আছে সেগুলির মধ্যে সত্তা (অস্তিত্ব) একটাই। সমগ্র সংসার প্রতি মুহূর্তে বদলাচ্ছে। এত তীব্রতার সঙ্গে বদলাচ্ছে যে একটিকে দ্বিতীয় বার দেখা যায় না। যেমন, নতুন বাড়ি কয়েক বছর পরে পুরাতন হয়ে যায়। তা প্রতি মুহূর্তেই বদলায় বলে পুরাতন হয়ে যায়। প্রতি মুহূর্তের এই পরিবর্তনকেই ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়, সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। প্রতি মুহূর্তে বদলালেও এটি আমাদের কাছে 'অস্তি' রূপে এইজন্যই প্রতীত হয় যে আমরা এই পরিবর্তনশীলের প্রতি 'অস্তি'-(পরমাত্মতত্ত্ব)-কে স্থান দিয়েছি এইটি মেনে নিয়ে যে 'এ আছে'। বাস্তবে এটি নেই বরং 'অস্তি'-র মধ্যেই সবকিছু আছে। এটি নিরন্তর বদলায়, কিন্তু 'অস্তি' যথা পূর্বং থেকে যায়। 'অস্তি' যত প্রত্যক্ষ এই সংসার ততটা প্রত্যক্ষ নয়। যা সব সময় বদলায় তা প্রত্যক্ষ হবে কি করে? 'অস্তি' এত প্রত্যক্ষ যে তার কখনও পরিবর্তন

হয় না। তার কখনও পরিবর্তন হবে না। পরিবর্তন হতে পারে না, পরিবর্তনের কোনো সম্ভাবনাও নেই। তাই গীতায় বলা হয়েছে—

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।

(২/১৬)

'অ-সতের ভাব (সত্তা) বিদ্যমান নেই এবং সৎ-এর অ-ভাব বিদ্যমান নেই।'

তাৎপর্য হলো, যা সর্বদা পরিবর্তিত হয় তা কখনও বিদ্যমান হতে পারে না আর যা কখনও পরিবর্তিত হয় না তা কখনও অবিদ্যমান হতে পারে না। 'নাস্তি' কখনও 'অস্তি' হতে পারে না এবং 'অস্তি' কখনও 'নাস্তি' হতে পারে না। অ-সৎ কখনও বিদ্যমান হতে পারে না আর 'অস্তি' সদা বিদ্যমানই থাকে। যা অবিদ্যমান তাকে ছেড়ে দিতে হবে এবং যা বিদ্যমান তাকেই লাভ করতে হবে—এ ছাড়া কথা আর কী হতে পারে! 'অস্তি'-কে স্বীকার করতে হবে এবং 'নাস্তি'-কে অস্বীকার করতে হবে—এইটিই হলো বেদান্ত, বেদের একেবারে সার কথা।

যা সত্তা (অস্তি) সেইটিই সৎ, সে সম্পর্কে যে জ্ঞান তা 'চিৎ' (চেতন) এবং তাতে যে দুঃখ, সন্তাপ, চাঞ্চল্যের বিশেষ অবিদ্যমানতা—সেইটি হলো 'আনন্দ'। সৎ-এর সঙ্গে জ্ঞান এবং জ্ঞানের সঙ্গে আনন্দ স্বতঃই পরিপূর্ণ। জ্ঞান ব্যতিরেকে সৎ আর সৎ ছাড়া জ্ঞান শূন্য। কোনো বিষয়ে জ্ঞান হওয়া মাত্র এক প্রসন্নতা দেখা দেয়—এইটিই হলো জ্ঞানের সঙ্গে আনন্দ। পরমাত্মতত্ত্ব হলো সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ। সেই সচ্চিদানন্দ পরমাত্মতত্ত্ব 'অস্তি'—রূপে যথাপূর্বং পরিপূর্ণ।

সাধকের 'সৎ' এবং 'চিৎ' (চেতন)-এর দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত। সৎ-এর স্বরূপ—কেবলই সত্তা আর চিৎ-এর স্বরূপ—কেবলই জ্ঞান। সৃষ্টির আধার হওয়ায় এটি 'সত্তা' (সৎ) এবং প্রতীতির প্রকাশক হওয়ায় এটি 'জ্ঞান' (চিৎ)। এই সত্তা এবং জ্ঞানই হলো আমাদের 'চিন্ময় সত্তা'—এইটি আমাদের স্বরূপ। যেমন, সুষুপ্তিতে এই অনুভূতি হয় যে 'আমার খুব ভাল ঘুম হয়েছে—অর্থাৎ আমি তো ছিলামই'—এটি হলো সত্তা আর 'আমার কিছুই মনে ছিল না'—এটি

হলো জ্ঞান। তাৎপর্য হলো, সুষুপ্তিতে নিজের সত্তা তথা অহং-এর অবিদ্যমানতার (আমার কিছুই মনে ছিল না-এর) জ্ঞান থাকে। যেমন, চোখ দিয়ে সব কিছু দেখা যায়, কিন্তু চোখ দিয়ে চোখকে দেখা যায় না; তাহলে একথা বলা যেতে পারে যে যার দ্বারা সব কিছু দেখা যায় তাই হলো চোখ। তেমনই অহং-এর থাকা এবং না-থাকা সম্পর্কে যার জ্ঞান আছে সেইটিই হলো চিন্ময় সত্তা (স্বরূপ)। সেই চিন্ময় সত্তার অবিদ্যমানতার জ্ঞান কখনও কারও হয় না। চিৎ-ই বুদ্ধিতে জ্ঞানরূপে আসে এবং পার্থিব জগতে (চোখের সামনে) প্রকাশরূপে আসে। বুদ্ধিতে জানা এবং না-জানা থাকে আর চোখের সামনে আলো এবং অন্ধকার থাকে। সমগ্র সংসারের স্থিতি যেমন একটি সত্তার অন্তর্গত তেমনই সমস্ত কিছু পড়া, শোনা, শেখা, বোঝা প্রভৃতি একটি জ্ঞানের অন্তর্গত। এই সৎ এবং চিৎ-কে সকলেই প্রত্যক্ষ করেছে। কারো কাছে তা লুকানো নয়। পুনশ্চ, যা অসৎ তা থেমে থাকে না এবং যা জড় তা টিকে থাকে না। সৎ, চিৎ-এর না-থাকা কখনই বিদ্যমান নয় এবং অ-সৎ ও জড়ের স্থিতি কখনও বিদ্যমান নয়। সৎ এবং চিৎ সব কিছুর পূর্বে ছিল, সব কিছুর পরেও থাকবে এবং এখনও যেমনকার তেমনই আছে।

যারা কালের সত্তাকে মেনে নেয় তাদের জন্য এই কথা বলা হয় যে, পরমাত্মতত্ত্ব অতীতের মধ্যেও আছে, ভবিষ্যতের মধ্যেও আছে এবং বর্তমানের মধ্যেও আছে। আসলে ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান কিছুই নেই, যা আছে তা হলো পরমাত্মতত্ত্ব। সেই পরমাত্মতত্ত্ব কালেরও মহাকাল, কালেরও ভক্ষক—

(১) ব্রহ্ম অগনি তন বীচমেঁ, মথকর কাঢ়ে কোয়।
উলট কালকো খাত হৈ, হরিয়া গুরুগম হোয়।।
(২) নবগ্রহ চৌসঠ জোগিণী, বাবন বীর প্রজংত।
কাল ভক্ষ সবকো করৈ, হরি শরণৈ ডরপংত।।

(করুণাসাগর ৬৪)

কাল তাকেই খেয়ে ফেলে যে জন্মগ্রহণ করেছে। যা জন্মায়নি তাকে কাল কি করে খাবে? এমনই যে পরমাত্মতত্ত্ব তা জীবমাত্রেরই নিত্যপ্রাপ্ত। সেই সর্বসমর্থ পরমাত্মতত্ত্বের মধ্যে এই শক্তিই নেই যে

কখনও কারও কাছ থেকে আলাদা হয়ে যাবে, কখনও কারও কাছে অপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। সে সদা, সর্বদা সকলের মধ্যে যেমনকার তেমনভাবেই বিদ্যমান, নিত্যপ্রাপ্ত। এটি 'পরমাত্মজ্ঞান'।

আত্মজ্ঞান এবং পরমাত্মজ্ঞান একই। তার কারণ চিন্ময় সত্তা একই, কিন্তু জীবের উপাধিতে আলাদা আলাদা দেখায়। ভগবান বলেছেন—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।

(গীতা ১৫/৭)

'এই সংসারে সৃষ্ট জীবের আত্মা সর্বদা আমারই অংশ।'

প্রকৃতির অংশ 'অহং'-কে ধরার জন্যই এই জীবকে অংশ বলা হয়। এই অহং-কে যদি ধরা না হয় তাহলে একই সত্তা থাকে। সত্তা ('হওয়া') ছাড়া আর সব কিছুই কল্পনা। এই চিন্ময় সত্তা সব কল্পনার আধার, অধিষ্ঠান, প্রকাশক, আশ্রয়, জীবনদাতা। সেই সত্তায় পরিচ্ছিন্নতা নেই। সেই চিন্ময় সত্তা সর্বব্যাপক। সমগ্র সৃষ্টি (ক্রিয়া এবং বস্তু) সেই সত্তার অন্তর্গত। সৃষ্টি তো উৎপন্ন ও বিনষ্ট হতে থাকে, কিন্তু সত্তা যেমনকার তেমনই থাকে, গীতায় আছে—

যথা সর্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে।।

(১৩/৩২)

"সর্বত্র পরিব্যাপ্ত আকাশ যেমন অত্যন্ত সূক্ষ্ম হওয়ার জন্য কোথাও লিপ্ত হয় না তেমনই সর্বত্র পরিপূর্ণ আত্মা কোনো দেহে লিপ্ত হয় না।'

তাৎপর্য হলো এই যে চিন্ময় সত্তা কেবল শরীরাদিতে স্থিত নয়, বরং আকাশের মতো সকল শরীরে, সমগ্র সৃষ্টির ভিতরে বাইরে সর্বত্র পরিপূর্ণ। সেই সর্বব্যাপী সত্তাই আমাদের স্বরূপ এবং সেইটিই পরমাত্মতত্ত্ব। এর মানে সর্বদেশীয় সত্তা একটিই। সেই সত্তার দিকেই সাধকের লক্ষ্য নিরন্তর থাকা উচিত।

প্রশ্ন—সত্তাতে পরিচ্ছিন্নতা দেখার কারণ কী?

উত্তর—সত্তাকে বুদ্ধির বিষয় গণ্য করলে অথবা মন, বুদ্ধি এবং অহং -এর সংস্কার থাকায় সত্তাতে পরিচ্ছিন্নতা দৃষ্ট হয়। বাস্তবে সত্তা মন-বুদ্ধি-অহং-এর অধীন নয়। সত্তা ঐগুলিকে প্রকাশ করে এবং ঐগুলির ঊর্ধ্বে। সত্তাতে মন, বুদ্ধি, অহং কিছুই নেই।

প্রশ্ন—এই পরিচ্ছিন্নতা দূর হবে কি করে?

উত্তর—পরিচ্ছিন্নতা দূর হোক—এই আগ্রহও ত্যাগ করে কেবল সত্তাতে স্থিত (মৌন) হয়ে যান। মৌন হয়ে গেলে মন-বুদ্ধি-অহং-এর সংস্কার স্বতঃই দূর হয়ে যাবে। যেমন, সমুদ্রে যে বরফের চাঁই ভেসে যায় তাকে গলাবার জন্য কিছু করার দরকার হয় না, সে নিজে থেকেই গলে যায়, তেমনই একমাত্র সত্তায় যে শরীর-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি-অহং প্রভৃতি প্রতীত হয় তাকে দূর করতেও হয় না, রেখে দিতেও হয় না। মৌন অর্থাৎ নির্বিকল্প হলে তা নিজে থেকেই গলে যায়।*

সত্তার দিকে দৃষ্টিপাত করলেই উপলব্ধি হয় যে সত্তা কখনই বদ্ধ হয়নি, তা সদা মুক্ত। তা যদি বদ্ধ হোত তাহলে কখনই মুক্ত হতে পারত না। আর যখন তা মুক্ত তখন তা কখনই বদ্ধ হতে পারে না। বন্ধনের ভাব (সত্তা) বিদ্যমান নয় এবং মুক্তির অ-ভাব বিদ্যমান নয়। বন্ধন কেবল মেনে নেওয়া। সেই মেনে নেওয়া ব্যাপারটা ত্যাগ করলে মুক্তি স্বতঃসিদ্ধ।

সকল মানুষই তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী। কেননা সকল মানুষই একই সত্তার অন্তর্গত। ক্রূরতম ভূত, প্রেত, পিশাচ, রাক্ষস প্রভৃতিতেও সেই এক সত্তা এবং সৌম্যতম সাধু, মহাত্মা, তত্ত্বজ্ঞ, জীবন্মুক্ত, ভগবৎপ্রেমীদের মধ্যেও সেই এক সত্তা। সেই সত্তা পরমাত্ম সত্তার সর্বদা অভিন্ন। কেবল সত্তার দিকে মুখ ফেরাতে হবে। তার জন্য কোনো অভ্যাস নয়। কোনো পরিশ্রম নয়। কোনো কঠিনতা নেই। নেই কোনো দুর্লভ্যতা। কারও প্রতি নির্ভরও নয়। সত্তায় মল নেই, বিক্ষেপ নেই, আবরণ নেই। অভ্যাস দৃঢ় এবং অ-দৃঢ় দু রকম হতে পারে। কিন্তু সত্তা দু রকম হতেই পারে না। সত্তা এবং তার জ্ঞান সর্বদা দৃঢ়ই হয়, অ-দৃঢ় হয় না।

---

*একটি হলো নির্বিকল্প অবস্থা, অন্যটি নির্বিকল্প বোধ। নির্বিকল্প অবস্থা করণ-সাপেক্ষ এবং নির্বিকল্প বোধ করণ-নিরপেক্ষ। তাৎপর্য এই যে নির্বিকল্প অবস্থা হয় মন বুদ্ধির, আর নির্বিকল্প বোধ, মন বুদ্ধির সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হওয়ার পর স্বয়ং-এর দ্বারা হয়। নির্বিকল্প অবস্থায় নির্বিকল্পতা অখণ্ডরূপে থাকে না, বরং তাতে ছেদ থাকে অর্থাৎ সেই স্থিতি থেকে সরে যেতে হয়। কিন্তু নির্বিকল্প বোধে নির্বিকল্পতা অখণ্ডরূপে থাকে এবং তাতে কখনও অন্তরায়ের সৃষ্টি হয় না। নির্বিকল্প অবস্থা থেকেও অসঙ্গ হয়ে গেলে নির্বিকল্পবোধের স্বতঃ সিদ্ধ অনুভূতি এসে যায়।

সর্বশ্রেষ্ঠ অনুকূল পরিস্থিতিতেও সেই সত্তা, সর্বাপেক্ষা প্রতিকূল অবস্থাতেও সেই সত্তা। জীবনেও সেই সত্তা, মৃত্যুতেও সেই সত্তা। অমৃতেও সেই সত্তা, গরলেও তাই। স্বর্গ এবং নরকে সেই একই সত্তা। রোগ-নিরোগ, বিদ্যা-অবিদ্যা এগুলিতেও সেই একই সত্তা, জ্ঞানীর মধ্যে সেই সত্তা, শূদ্রের মধ্যেও তাই। বন্ধু এবং শত্রুতেও সেই একই সত্তা। বলবানেও সেই সত্তা, দুর্বলেও সেই সত্তা। চিন্ময় সত্তা সেইটিই (সেই একই)। আমরা যদি সেই সত্তায় অবস্থান করি তাহলে এইসব অনুকূলতা-প্রতিকূলতা কিছুই থাকে না। যেসব ছোট শিশু মায়ের কোলে থাকে, কোল থেকে নামালেই সে কাঁদতে শুরু করে। সেই রকম আমরা যেন সেই সত্তাতেই থাকি। সেই সত্তা থেকে যেন নিচে না নামি। যদি কখনও তা থেকে সরে যাই, তাহলে ব্যাকুল হয়ে যেতে হয়! আনুকূল্য আসুক কিংবা প্রতিকূলতা; জন্ম হোক অথবা মৃত্যু, ব্যাধিমুক্ত হই অথবা ব্যধিগ্রস্ত; সংযোগ হোক অথবা বিচ্ছেদ; সম্পত্তি-বিপত্তি যাই হোক; লাভই হোক অথবা লোকসান, কোটিপতি হই কিংবা ভিক্ষুক; চিন্ময় সত্তাতে কোন অন্তরায় হয় না। সত্তাতে কোনও পার্থক্য হয় না। তাতে কিছু হয়নি, কিছু হচ্ছে না, কিছু হবে না, আর কিছু হতেও পারে না। যদি কিছু হয়ও তবু তা টিকবে না আর সত্তা নিঃশেষ হবে না। সেই সত্তায় আমাদের স্থিতি স্বতঃই রয়েছে।

'অস্তি'-তে আমাদের স্থিতি স্বতঃই থাকে এবং 'নাস্তি'-তে আমরা স্থিতিকে মেনে নিয়েছি। আমি পুরুষ, আমি স্ত্রী; আমি বালক, আমি যুবক, আমি বৃদ্ধ, আমি বলবান, আমি নির্বল; আমি বিদ্বান, আমি মূর্খ—এই সবই হলো মেনে নেওয়া স্থিতি। বাস্তবে, আমাদের স্থিতি সর্বদা 'অস্তি'-তেই থাকে। সেই 'অস্তি' ছাড়া আর কারও কোনো সত্তা নেই। সেই 'অস্তি'-র সমান বিদ্যমান কেউ হয়নি, হবে না, হতে পারে না। সে সব সময় একই রকম অবস্থান করে। তা সকলের কাছেই প্রকাশ্য, কারও কাছে গোপন নয়। সেইটিই ব্রহ্মজ্ঞান, তত্তজ্ঞান। যিনি 'অস্তি' (চিন্ময় সত্তা)-তে স্থিত, তিনি তত্ত্বজ্ঞানী, জীবন্মুক্ত, মহাত্মা। গীতায় আছে—

সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎ স্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।।

(১৩/২৭)

'যে নশ্বর সকল প্রাণীর মধ্যে পরমাত্মাকে অবিনাশী এবং সমরূপে স্থিত দেখে ('নাস্তি'-কে না দেখে কেবল 'অস্তি'-কে দেখে) সেই প্রকৃতপক্ষে ঠিক দেখে।'

সমং পশ্যন্হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্।।

(১৩/২৮)

'কারণ যিনি সর্বত্র সমরূপে স্থিত ঈশ্বরকে সমরূপে দেখেন সেই মানুষ আত্মার দ্বারা আত্মাকে হনন করেন না। সেই হেতু তিনি পরম গতি প্রাপ্ত হন।'

❁ ❁ ❁

(৩) সর্বাপেক্ষা সুগম পরমাত্মপ্রাপ্তি

পরমাত্মতত্ত্বকে পাওয়ার মতো সুগম ও শীঘ্র সিদ্ধ হয় এমন কোনো কাজ নেই, ছিল না, হবে না, হতে পারে না। যে বস্তু নেই, যাকে তৈরি করতে হয়, সেই বস্তুর প্রাপ্তিতে তো পরিশ্রম ও সময় লাগে। যা স্বতঃ স্বাভাবিক বিদ্যমান তার প্রাপ্তিতে পরিশ্রম এবং সময় কেন লাগবে? যেমন গঙ্গাকে পৃথিবীতে আনতে অনেক শক্তি লেগেছিল এবং অনেক জন্ম শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখন গঙ্গা বর্তমান—এটি জেনে নিতে পরিশ্রমও নেই, সময়ও লাগে না। কিন্তু নিজের মধ্যে যদি ক্ষুধা এবং আগ্রহ না থাকে তাহলে এই সুগমতা কোন্ কাজের? যদি স্বয়ং-এর আগ্রহ থাকে তাহলে সকল মানুষই সুগমতাপূর্বক এবং তৎকালেই জীবন্মুক্ত হতে পারে।

পরমাত্মতত্ত্ব লাভ করা, জীবন্মুক্তি সকলের কাছে সুগম কি করে—এই বিষয়টি বোঝবার চেষ্টা করুন। 'আমি আছি'—এটি প্রত্যেক মানুষই উপলব্ধি করে। ছেলেবেলা থেকে এখনও পর্যন্ত শরীর সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে, কিন্তু আমি সেই একই আছি। ভবিষ্যতে বৃদ্ধাবস্থাতে শরীর বদলে গেলেও সেই আমিই থাকব। শরীর বদলাবে, কিন্তু আমি বদলাব না। তাৎপর্য হলো শরীর বদলালেও সত্তার পরিবর্তন হয় না। আমরা শরীর ত্যাগ করে অন্য যোনিতে গেলেও সত্তার পরিবর্তন হবে না, অর্থাৎ আমরা সেই একই থাকব। আমরা যদি দেবতা হয়ে যাই তাহলে সেই একই থাকব; মানুষ, পশু-পাখি, বৃক্ষ-লতা, ভূত-প্রেত-পিশাচ যা কিছুই হই না কেন আমরা সেই একই থাকব। স্থাবর-জঙ্গম যে কোনো যোনিতে গেলেও স্বয়ং সদা-সর্বদা সেই যেমনকার তেমনই থেকে যায়।

জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি—তিন অবস্থাতে আমরা একই থাকি। সুষুপ্তি থেকে জেগে উঠে বলি যে আমি এমন ঘুমিয়েছি যে কিছু মনে ছিল না। 'আমার কিছুই মনে ছিল না'—এইটিতো মনে ছিল। অতএব সুষুপ্তিতেও

আমাদের সত্তা প্রমাণিত। সুষুপ্তির মতো প্রলয়-মহাপ্রলয় হয়ে থাকে। প্রলয়-মহাপ্রলয়েও সকল জীবের সত্তা থাকে। সুষুপ্তি থেকে জাগৃতিতে যেমন আসা হয়, তেমনই প্রলয়-মহাপ্রলয় থেকে সর্গ-মহাসর্গে আসা হয়। তাৎপর্য হলো, মহাসর্গ এবং মহাপ্রলয়ে, সর্গ এবং প্রলয়ে, জন্ম এবং মৃত্যুতে স্বয়ং যেমনকার তেমন থাকে। সেই চিন্ময় সত্তা (হওয়া)-ই আমাদের স্বরূপ। শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহং আমাদের স্বরূপ নয়, কেননা এগুলি সবই দৃশ্য।

শরীর বদলায়, মন বদলায়, বুদ্ধি বদলায়, ভাব, সিদ্ধান্ত, স্বীকৃতি, দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি, অবস্থা, পরিস্থিতি, ঘটনা, সবকিছু বদলে যায়; কিন্তু সত্তা বদলায় না। সবকিছুর সংযোগ ও বিয়োগ হয়ে থাকে, কিন্তু সত্তার সংযোগ বা বিয়োগ কিছুই হয় না। যা বদলায় এবং যার সংযোগ-বিয়োগ হয় তা আমাদের স্বরূপ নয়। মানুষের কাঠামো (শরীর) এক রকম আর কুকুরের কাঠামো আর এক রকমের। কিন্তু উভয়ের মধ্যে সত্তা এক। সে সত্তা নারী নয়, পুরুষ নয়, দেবতা নয়, পশু-পাখি নয়, ভূত-প্রেতও নয়। এইরকমভাবে সত্তা জ্ঞানী নয়, অজ্ঞানীও নয়; মূর্খ নয়, বিদ্বানও নয়; নির্বল নয়, বলবানও নয়; সাধু নয়, গৃহস্থও নয়; ব্রাহ্মণ নয়, শূদ্রও নয়; হাল্কা নয়, ভারীও নয়; ছোট নয়, বড়ও নয়; সূক্ষ্ম নয়, স্থূলও নয়। নারী হোক, পুরুষ হোক, দেবতা হোক, পশু হোক, ভূত-প্রেত হোক, জ্ঞানী হোক, অজ্ঞানী হোক, কসাই হোক, সাধু-সন্ত হোক, তত্ত্বজ্ঞানী হোক অথবা ভগবৎ প্রেমী, যাই হোক সত্তা একই। সেই চিন্ময় সত্তা বদলায় না; দূর হয় না, আসে না, যায়ও না। সেই সত্তা হলো আমাদের স্বরূপ। এইটিই হলো কথা। এর বেশি আর কোনো কথা নেই। শাস্ত্রে, বেদে অথবা বেদান্তে এর চেয়ে বড় কথা আর কী আছে? যদি ব্রহ্মের কথা বলেন তবে তাও সত্তা। আমাদের দিক থেকে যে ভুলটি হয় তা হলো ঐ সত্তার সঙ্গে আমরা অন্য কিছুকে মিশিয়ে দিই। কিছু না মেশালে তো জীবন্মুক্তি। আর কিছু মেশালে বদ্ধ হয়ে যাই। আমি হলাম নারী, এটি হলো বন্ধন। আমি পুরুষ, এটিও বন্ধন। আমি বালক, আমি যুবক, আমি বৃদ্ধ, আমি রুগী, আমি নীরোগ, আমি বোঝদার, আমি অজ্ঞানী—এই সবগুলিই হলো বন্ধন। চিন্ময় সত্তার

সঙ্গে কিছু মিশ্রিত করাই হলো বন্ধন আর না মেশানো হলো মুক্তি। চিন্ময় সত্তা ছাড়া আমাদের আর কোনো স্বরূপই নেই। এইটিই তত্ত্বজ্ঞান। একেই ব্রহ্মজ্ঞান বলা হয়। কেউ যদি ছয়টি শাস্ত্র পড়ে ফেলেন , আঠারটি পুরাণ, আঠারটি উপপুরাণ, চারটি বেদ পড়ে ফেলেন; হাজার হাজার বছর ধরে যদি পড়তেই থাকেন তবু এর চেয়ে বড় কোনো কথা তিনি পাবেন না। এর চেয়ে বড় কোনো কথাই নেই তো পাবেন কোথা থেকে? এই জন্যই সাধুরা বলেছেন—

বাবর বেদ বিদুষ বাবরিয়ো, পোথী পুস্তক ফন্দা।
ভোলা নর মাঁহী উলঝানা, উলট ন দেখে অন্ধা।।

প্রশ্ন—জীবাত্মার সত্তা এবং পরমাত্মার সত্তা দুটি কি এক, না আলাদা?

উত্তর—সত্তা এক, কিন্তু সত্তায় 'অহং' (আমি)-কে মিশিয়ে দেওয়ায় পার্থক্য দেখা যায়। তার কারণ অহং থেকে পরিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয় এবং পরিচ্ছিন্নতা থেকে সকল ভেদ সৃষ্টি হয়। বাস্তবিক সত্তা অহং রহিত হওয়ায় তা অপরিচ্ছিন্ন। সেই সত্তায় সকলের স্বতঃস্বাভাবিক স্থিতি আছে, কিন্তু অহংকে স্বীকৃতি দেওয়ার ফলে তাকে অনুভব করা যাচ্ছে না।

অহংকে জীবিত না রাখা হলো সাধকের প্রধান কাজ। 'আমি হলাম ব্রহ্ম'—এই ভাব অহং-কে জীবিত রাখে। কেননা 'আমি' ব্রহ্ম নয় এবং ব্রহ্মে 'আমি' নেই। 'আমি'-র সঙ্গে 'হলাম'-কে জোড়া এবং 'হলাম'-এর সঙ্গে 'আমি'-কে জোড়া হলো 'চিজ্জড়গ্রন্থি'। এই 'আমি' হলো কেবল মেনে নেওয়া, বাস্তবে তার অস্তিত্ব নেই। তাই একে যেখানে লাগাবেন সেখানেই তা প্রবেশ করে যায়। জড়ের মধ্যে প্রবেশ করে বলে 'আমি হলাম শরীর', 'আমি হলাম ধনী' প্রভৃতি। চেতনে প্রবেশ করে বলে 'আমি হলাম ব্রহ্ম', 'আমি হলাম শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মা' প্রভৃতি। কিন্তু উভয়ের মধ্যে অহং সেই একই।

'আমি হলাম ব্রহ্ম'—এটি হলো অনাত্মা (অসৎ, জড়, উৎপত্তি-বিনাশশীল)-এর তাদাত্ম্য। তার কারণ অনাত্মার তাদাত্ম্য ছাড়া, অনাত্মার সহায়তা ছাড়া কেবল আত্মতত্ত্বের দ্বারা পরমাত্মার চিন্তন, ধ্যান, সমাধি

প্রভৃতি হতেই পারে না। চিন্তন, ধ্যান প্রভৃতি যদি করেন তাহলে অনাত্মার অধীনতা স্বীকার করে নিতে হবে, অনাত্মাকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হবে। যার সহায়তা নেবেন তাকে ত্যাগ করবেন কি করে ? আর অনাত্মাকে ত্যাগ না করলে আত্মতত্ত্বের উপলব্ধি কি করে হবে ? আত্মতত্ত্বের উপলব্ধি তো অনাত্মার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেই হতে পারে।

যা প্রতীত হয়, সেই দৃশ্যও (শরীর) আমাদের স্বরূপ নয় এবং যার আভাস লক্ষিত হয় সেই অহংও আমাদের স্বরূপ নয়। অহংকে সঙ্গে নিয়ে সাধনা করলে নতুন অবস্থা প্রাপ্ত হতে পারে, কিন্তু অবস্থাতীত তত্ত্বকে লাভ করা যায় না। অবস্থাতীত তত্ত্ব অহং অবিদ্যমান হলেই প্রাপ্ত হয়। অহং থাকলে এমন অহঙ্কার হতেই পারে যে, 'আমি বোধ লাভ করেছি, আমি জ্ঞানী হয়েছি, আমি জীবন্মুক্ত হয়ে গিয়েছি'। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বোধ, তত্ত্বজ্ঞান, জীবন্মুক্তি অহং অবিদ্যমান হলেই হতে পারে। তাৎপর্য হলো, সত্তার জ্ঞান সত্তাতেই হতে পারে, 'আমার' দ্বারা তা হয় না। সত্তা তো জ্ঞানস্বরূপ এবং সেই জ্ঞানের জ্ঞাতা কেউ নয়। কেননা জ্ঞেয়র যখন সত্তাই নেই তখন জ্ঞাতা সংজ্ঞা কেমন করে হবে ?

জাগ্রত এবং স্বপ্নাবস্থায় অহং-এর ভাব দৃষ্ট হয় এবং সুষুপ্তি অবস্থায় অহং-এর অবিদ্যমানতা দৃষ্ট হয়। অহং-এর ভাব এবং অ-ভাব দুটিকেই চেতনতত্ত্ব প্রকাশিত করে। যা ভাব এবং অ-ভাবকে প্রকাশিত করে তা 'সৎ' এবং যার ভাব এবং অ-ভাব হয় তা হলো 'অসৎ'। যেমন আলো এবং অন্ধকার দুটিকে চোখ প্রকাশিত করে, তেমনই বিবেক অহং-এর ভাব ও অ-ভাব দুটিকেই প্রকাশিত করে। অহং-এর ভাব দূর হয়ে তা অবিদ্যমান হয়ে যায়, জড়তা দূর করে চেতন থেকে যায়—তখন বোধ বিবেকে পরিণত হয়ে যায়।

পরমাত্মতত্ত্বের প্রাপ্তিও সহজ এবং অহং-এর নিবৃত্তিও সহজ। তার কারণ, পরমাত্মতত্ত্বের নিত্য প্রাপ্তি হয় এবং অহং-এর নিত্যনিবৃত্তি হয়। অহংকে দূর করার চেষ্টা করলে অহং সম্পর্কে বিবেচনা করা হয় কিন্তু অহং দূর হয় না। কিন্তু সর্বত্র পরিব্যাপ্ত পরমাত্মসত্তার অনুভূতি হয়ে গেলে অহং দূর হয়ে যায়। তাই গীতায় ভগবান বলেছেন—

'ময়া ততমিদং সর্বম্' (৯/৪)

'এই সমগ্র সংসার আমার দ্বারা পরিব্যাপ্ত।'

তাৎপর্য হলো সংসারে এক সম, শান্ত, সদ্‌ঘন, চিদ্‌ঘন, আনন্দঘন পরমাত্মতত্ত্বের সত্তা ('অস্তি')-রূপে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে।* প্রতিমুহূর্তে যা অবিদ্যমান হয়ে যাচ্ছে সেই সংসারের স্বতন্ত্র সত্তাই নেই। অজ্ঞানতাবশত সংসারের যে সত্তা প্রতীত হয় তাও পরমাত্মতত্ত্বের সত্তার কারণে হয়ে থাকে—

জাসু সত্যতা তেঁ জড় মায়া। ভাস সত্য ইব মোহ সহায়া।।

(রামচরিতমানস ১/১১৭/৪)

ভগবান বলেছেন—

মনসা বচসা দৃষ্ট্যা গৃহ্যতেঽন্যৈরপীন্দ্রিয়ৈঃ।
অহমেব ন মত্তোঽন্যদিতি বুধ্যধ্বমঞ্জসা।।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১/১৩/২৪)

'মন, বুদ্ধি, দৃষ্টি তথা অন্য ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা যা কিছু গ্রহণ করা হয় তা সবই আমি। অতএব আমি ছাড়া আর কিছু নেই—এই সিদ্ধান্ত আপনারা বিচারপূর্বক শীঘ্র বুঝে নিন, অর্থাৎ স্বীকার করে নিন।'

তাৎপর্য হলো কেবল পরমাত্মতত্ত্বই চিন্ময় সত্তারূপে গ্রহণীয়। তার কারণ কেবল সত্তাকেই গ্রহণ করা যায়। যার অস্তিত্বই নেই তাকে কি করে গ্রহণ করা যাবে?

যখন সকলের মধ্যে এক অবিভক্ত সত্তা (অস্থি)-ই পরিব্যাপ্ত তাহলে আর তার মধ্যে আমি, তুমি, এটি, সেটি—এই চারটি বিভাগ কিঁ করে হতে পারে? অহংত্ব এবং মমত্ব কি করে হতে পারে? অনুরাগ-দ্বেষ কি করে হতে পারে? যার অস্তিত্বই নেই তাকে দূর করবার অভ্যাসই বা কি করে হবে?

ভগবান বলেছেন—

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।

(গীতা ২/১৬)

* ভগবান গীতাতে জীবাত্মার জন্য 'যেন সর্বমিদং ততম্' (২/১৭) বলেছেন আবার পরমাত্মার জন্যও 'যেন সর্বমিদং ততম্' (৮/২২; ১৮/৪৬) বলেছেন। তাৎপর্য হলো জীবাত্মা এবং পরমাত্মা দুটিরই সর্বত্র পরিব্যাপ্ত সত্তা একটিই।

'অ-সতের ভাব বিদ্যমান নেই এবং সতের অ-ভাব বিদ্যমান নেই।'

তাৎপর্য হলো অ-সতের নিত্যনিবৃত্তি এবং সতের নিত্যপ্রাপ্তি। নিত্যনিবৃত্তির নিবৃত্তি এবং নিত্যপ্রাপ্তের প্রাপ্তিতে কঠিনতাই বা কী এবং সুগমতাই বা কী? কী করবেন আর কী করবেন না? পাবেনই বা কী বা হারাবেনই বা কী?

খোয়া কহে সো বাবরা, পায়া কহে সো কূর।
পায়া খোয়া কুছ নহীঁ, জ্যোঁ-কা-ত্যোঁ ভরপূর।।

সর্বত্র পরিব্যাপ্ত চিন্ময় সত্তায় দেশ নেই, কাল নেই, বস্তু, ব্যক্তি, অবস্থা, পরিস্থিতি, ঘটনা কিছুই নেই। সেই সত্তায় আসা নেই, যাওয়া নেই; বাঁচা নেই, মরা নেই; নেওয়া নেই, দেওয়া নেই; কিছু করা নেই, কিছু না করা নেই; সমাধি নেই, বুত্থান নেই; বন্ধন নেই, মোক্ষ নেই; ভোগেচ্ছা নেই, মুমুক্ষতা নেই; বলা নেই, শোনা নেই; লেখাপড়া নেই, প্রশ্ন-উত্তর নেই। তাতে কোনো লাভ নেই, লোকসান নেই; কেউ বড় কেউ ছোট নেই; কেউ ভাল কেউ মন্দ নেই—

কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতস্যাবস্তুনঃ কিয়ৎ।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১/২৮/৪)

'যখন দ্বৈত বলে কোনো বস্তু নেই, তখন তাতে ভালই বা কী আর খারাপই বা কী'?

ভাল-মন্দ, ঠিক-বেঠিক, বিধি-নিষেধ—এইসবগুলিই মনুষ্যলোকের সীমানা। সীমার মধ্যে চলা মানুষের কর্তব্য। সীমা মেনে ঠিকভাবে চললে বিবেকের প্রতিষ্ঠা হয় এবং বিবেকের প্রতিষ্ঠা হলে বিবেক বোধে পরিণত হয়ে যায়। বোধ হয়ে গেলে কিছু করা, জানা এবং পাওয়া বাকি থাকে না অর্থাৎ মানুষ কৃতকৃত্য, জ্ঞাতজ্ঞাতব্য এবং প্রাপ্তপ্রাপ্তব্য হয়ে যায়।

অদ্যাবধি দেব, রাক্ষস, পশু, পক্ষী, মানুষ প্রভৃতি অনেক যোনিতে যত কাজই করা হয়ে থাকুক এবং তার ফলভোগ হয়ে থাকুক সেগুলির মধ্যে কোনো কর্মই এবং ফলভোগ সত্তা পর্যন্ত পৌঁছয়নি। আকাশে কখনও সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়ে, কখনও অন্ধকার হয়ে যায়, কখনও ধোঁয়ায় ভরে যায়, কখনও বা কাল মেঘে আকাশ ঢাকা পড়ে, কখনও

বিদ্যুৎ চমকায়, কখনও বৃষ্টি হয়, কখনও শিলাবৃষ্টি হয়, কখনও নানা রকম শব্দে আকাশ ভরে যায়, গর্জন হয়; কিন্তু আকাশে কোনো তারতম্য হয় না। তা যেমনকার তেমনই নির্লিপ্ত নিরাকার থাকে। এইভাবেই সর্বত্র পরিপূর্ণ সত্তায় কখনও মহাসর্গ এবং কখনও মহাপ্রলয় হয়; কখনও সর্গ এবং কখনও প্রলয় হয়; কখনও জন্ম এবং কখনও মৃত্যু হয়; কখনও অকাল এবং কখনও বন্যা হয়; কখনও ভূমিকম্প হয়, কখনও ঘোরতর যুদ্ধ হয়; কিন্তু সত্তায় কোনো তারতম্য হয় না। ওলট-পালোট যতই হোক না কেন, সত্তা যেমনকার তেমন নির্লিপ্ত নির্বিকার থেকে যায়। এইজন্য গীতায় বলা হয়েছে—

সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎ স্যবিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।।

(১৩/২৭)

'যে নষ্ট হতে থাকলেও সমগ্র প্রাণীতে পরমাত্মাকে নাশরহিত এবং সমরূপে স্থিত দেখে সেই বাস্তবে ঠিক দেখে'।

প্রকৃত্যৈব চ কর্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্তারং স পশ্যতি।।

(১৩/২৯)

'যে সকল ক্রিয়াগুলি সর্বপ্রকারে প্রকৃতির দ্বারাই সম্পন্ন হয় বলে দেখে এবং নিজেকে অকর্তা দেখে অর্থাৎ উপলব্ধি করে সেই বাস্তবে যথার্থ দেখে।'

এইভাবে সত্তায় নিজের স্থিতিকে উপলব্ধ করে নিশ্চুপ হয়ে যাওয়া উচিত। সাধককে নিশ্চুপ হওয়ার জন্য তিনটি কথা চিন্তা করতে হবে—

(১) 'আমি' এবং 'আমার' বলে কিছু নেই। কেননা স্বরূপ সত্তামাত্র, আর কিছুই নয়। তাহলে আমি এবং আমার হলোটা কে?

(২) আমার কিছুই চাই না। কেননা সত্তায় কোনো কিছুরই অভাব নেই। তাহলে পাওয়ার ইচ্ছা হবে কি করে?

(৩) নিজের জন্য কিছুই করতে হবে না। কেননা যে করণগুলির দ্বারা কর্ম হয় সেই করণগুলিও প্রকৃতিতে আছে, আর যে কর্ম করে

সেই অহঙ্কার (কর্তৃত্ববোধ)ও প্রকৃতিতে আছে। সুতরাং স্বরূপে করবার যোগ্যতাও নেই এবং করবার দায়িত্বও নেই।

এইভাবে চিন্তা করে মৌন হয়ে যান, সব কিছু থেকে বিমুখ হয়ে কেবল সত্তায় স্থিত হয়ে যান। এইটিই হলো 'মৌন সাধনা'। স্থূলশরীরের ক্রিয়া হবে না, সূক্ষ্ম শরীরেও চিন্তন হবে না এবং কারণ-শরীরের সুষুপ্তি হবে না। তখনই মৌন সাধনা হয়। এতে কোনো ক্রিয়া নেই। প্রত্যুত যার দ্বারা ক্রিয়া প্রকাশিত হয় সেই অক্রিয় তত্ত্বে স্থিতি স্বতঃসিদ্ধভাবে হয়ে যায়। এতে বৃত্তি লাগাতে বা সরাতে হয় না। প্রত্যুত বৃত্তিকে যে জ্ঞানের অন্তর্গত বলে দৃষ্ট হয় সেই জ্ঞানে স্থিতি স্বতঃসিদ্ধ। এই মৌন সাধনা সমাধির চেয়েও বড়; কেননা এতে বুদ্ধির সঙ্গে এবং অহং-এর সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। এইজন্য সমাধিতে লয়, বিক্ষেপ, কষায় এবং রসাস্বাদ—এই চারটি দোষ (বিঘ্ন) থাকে। কিন্তু মৌন সাধনায় কোনো দোষ থাকে না।

চিন্ময় সত্তা অক্রিয় এবং তাতে অনন্ত সামর্থ্য আছে। ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, লয়যোগ, হঠযোগ প্রভৃতি যত যোগ আছে সেই সবই এই অক্রিয় তত্ত্ব থেকে প্রকট হয়। এই অক্রিয় তত্ত্ব সকল সাধনার ভূমি অর্থাৎ সকল সাধনা এর দ্বারাই প্রকট হয় এবং এতেই বিলীন হয়ে যায়। মৌন সাধনায় অক্রিয় তত্ত্ব (সত্তামাত্রে) নিজের স্বতঃস্বাভাবিক এবং সহজ স্থিতি উপলব্ধ হয় অর্থাৎ অহং দূর হয়ে যায় এবং সম, শান্ত, সদ্‌ঘন, চিদ্‌ঘন, আনন্দঘন পরমাত্মতত্ত্ব অবশিষ্ট থেকে যায়—

ঢূঁঢ়া সব জঁহা মেঁ, পায়া পতা তেরা নহীঁ।
জব পতা তেরা লগা, তো অব পতা মেরা নহীঁ।।

সাধুরা এই অবস্থাতীত সহজাবস্থার বর্ণনা এইভাবে করেছেন—

অপন পৌ আপহি মেঁ পায়ো।
শব্দ-হি শব্দ ভয়ো উঁজিয়ারা, সতগুরু ভেদ বতায়ো।।
জৈসে সুন্দরী সুত লৈ সূতী, স্বপ্নে গয়ো হিরাঈ।
জাগ পরী পলঙ্গ পর পায়ো, ন কুছ গয়ো ন আঈ।।
জেসে কুঁবরী কণ্ঠ মণি হীরা, আভূষণ বিসরায়ো।

সঙ্গ সখী মিলি ভেদ বতায়ো, জীব কো ভরম মিটায়ো।।
জৈসে মৃগ নামী কস্তুরী, ঢূঢত বন বন ধায়ো।
নাসা স্বাদ ভয়ো জব বাকে, উলটি নিরন্তর আয়ো।।
কহা কহূ বা সুখ কী মহিমা, জ্যোঁ গুঙ্গে গুড় খায়ো।
কহৈ কবীর সুনো ভাই সাধো, জ্যোঁ-কা-ত্যোঁ ঠহরায়ো।।

তাৎপর্য হলো যে সাধক নিজের মধ্যে 'আমি আছি' এই রকম পরিচ্ছিন্ন (একদেশীয়) সত্তাকে উপলব্ধি করতেন তিনিই 'আমি'-র বিনাশ হওয়ার পর অপরিচ্ছিন্ন সত্তাকে উপলব্ধি করেন অর্থাৎ 'আছি'-তে 'আছে'-কে পেয়ে যান। তখন আর 'আছি' থাকে না, একমাত্র 'আছে'-ই থাকে।

অনুরাগ-দ্বেষ, হর্ষ-শোক, কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব, জড়তা, পরিচ্ছিন্নতা প্রভৃতি সব বিকার অহং-এ থাকে। সাধক সেই অহংকে নিজের মধ্যে স্বীকার করে রেখেছেন তাই অহংকে বিনাশ করার জন্য পরমাত্মতত্ত্বকে স্বীকার করা অর্থাৎ 'আছি'-তে 'আছে'-কে স্বীকার করা প্রয়োজন।

একটি মার্মিক কথা হলো, 'আছি'-তে 'আছে'-কে মেলান অপেক্ষা 'আছি'-কে 'আছে'-তে মেলান শ্রেয়। 'আমি' কেবল ভগবানেরই আর কারও নয়। এইভাবে নিজেই নিজেকে ভগবানে অর্পিত করে দেওয়া, ভগবানের শরণাশ্রিত হওয়াই হলো 'আছি'-কে 'আছে'-তে মিলিয়ে দেওয়া। 'আছি'-তে 'আছে'-কে মিলিয়ে দিলে সূক্ষ্ম পরিচ্ছিন্নতা থেকে যায়। তার কারণ 'আছি'-তে অনাদিকাল থেকে পরিচ্ছিন্নতার সংস্কার রয়েছে। এটি 'আছে'-তে নেই। তাই 'আছি'-কে 'আছে'-তে অর্পণ করলে পরিচ্ছিন্নতা, অহং সহজে সম্পূর্ণরূপে অবিদ্যমান হয়ে যায়।

'আছি'-কে 'আছে'-তেই মেলান অথবা 'আছে'-তে 'আছি'-কে মেলান দুটির পরিণাম একই হবে; অর্থাৎ 'আছি' থাকবে না, 'আছে' থাকবে। যেমন—কর্মযোগী কর্মে অকর্মকে এবং অকর্মে কর্মকে দেখেন—**'কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ'** (গীতা ৪/১৮); অতএব পরিণামে কর্ম থাকে না, অকর্ম থেকে যায়। জ্ঞানযোগী সকল প্রাণীর মধ্যে আত্মাকে তথা আত্মাতে সকল প্রাণীকে দেখেন—

'সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি' (গীতা ৬/২৯); অতএব পরিণামে প্রাণী থাকে না, আত্মা থেকে যায়। ভক্তিযোগী সকলের মধ্যে ভগবানকে এবং ভগবানের মধ্যে সকলকে দেখেন—**'যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্ব চ ময়ি পশ্যতি'** (গীতা ৬/৩০); অতএব পরিণামে সবকিছু থাকে না, ভগবান থেকে যান। তত্ত্বগতভাবে অকর্ম, আত্মা এবং ভগবান তিনটি একই।

❀ ❀ ❀

(৪) অ-সতের ত্যাগ এবং সতের সন্ধান

যাকে আমরা অ-সৎ বলে জানি তাকে ত্যাগ করলে তত্ত্বের স্বতঃসিদ্ধ উপলব্ধি হয়ে যায়। বাস্তবে অ-সতের সত্তা বিদ্যমান নেই—'নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ'। অ-সৎ একেবারেই অবিদ্যমান। আমি, তুমি, এটি, সেটি—এই চারটির কোনো সত্তাই নেই। দেখায়, শোনায়, মানায়, চিন্তা করায় যা কিছুই উপস্থিত হয় বাস্তবে তাদের কোনো অস্তিত্ব নেই। ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ, অহঙ্কার—এই তিনটি নেই-ই।

আমরা জানি সংসার সব সময় বদলাচ্ছে। এটি আগে যেমন ছিল, এখন সে রকম নেই এবং এখন যেমন আছে, পরে সে রকম থাকবে না; কিন্তু আমরা এটি জেনেও সংসারের সত্তা মানি—এটি হলো অ-সতের সত্তাকে স্বীকার করা। জ্ঞাত অ-সতের সত্তাকে স্বীকার এবং তাকে গুরুত্ব দেওয়া বন্ধনের মূল কারণ।

প্রত্যেক মানুষেরই অ-সৎকে ত্যাগ করবার সামর্থ্য আছে, আছে স্বাতন্ত্র্যও। অ-সৎকে ত্যাগ করতে কেউই অসমর্থ এবং পরাধীন নয়। এখন চিন্তা করতে হবে যে অ-সৎকে অ-সৎরূপে জানার পরেও কেন তার আকর্ষণ হচ্ছে? তাকে ত্যাগ কেন করা যাচ্ছে না?

যখন আমরা নিজেদের মধ্যে অ-সতের সত্তা স্বীকার করে নিই এবং সেই সত্তাকে গুরুত্ব দিই তখন অ-সতের আকর্ষণ হয়। সংসর্গ-জনিত সুখের ইচ্ছা পোষণ করাই হল নিজের মধ্যে অ-সতের সত্তা এবং গুরুত্বকে স্বীকার করা। চিন্তা করার সময় তো আমরা সংসারকে অ-সৎ বলে মেনে নিই কিন্তু অন্য সময় অ-সতের সংসর্গ-জনিত সুখ ভোগ করি। তাই (সুখাসক্তির) কারণে অ-সৎকে ত্যাগ করা কঠিন বলে মনে হয়।

সংসর্গজনিত সুখের আগে তা না পাওয়ার দুঃখ থাকে, অন্তিমে তার বিচ্ছেদের জন্য দুঃখ থাকে এবং মধ্যখানে প্রতিমুহূর্তে তা অবিদ্যমান হয়ে যাচ্ছে—এই জ্ঞান জাগ্রত হলে সুখের ইচ্ছা দূর হয়ে যায়। কারণ

অবিদ্যমানতাই অবশিষ্ট থাকে এবং অবিদ্যমানতায় সুখ থাকতে পারে না। গীতাতে আছে—

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ।।

(৫/২২)

'হে কুন্তীনন্দন! ইন্দ্রিয় এবং বিষয়ের সংযোগে যেসব ভোগ সৃষ্ট হয় সেগুলির উৎপত্তি ও বিনাশ আছে এবং সেগুলি দুঃখের কারণ। অতএব বিবেকী মানুষ তাতে রমণ করেন না।'

বিবেককে অনাদর করার ফলে মানুষ আরম্ভকে দেখে, পরিণামকে দেখে না। সুখভোগের পরিণামে দুঃখ আসবেই—এইটিই নিয়ম। কারণ সুখভোগের পরিণামে নিজের শক্তি হ্রাস এবং ভোগ্যবস্তুর বিনাশ হয়—এইটিই নিয়ম। মানুষ যদি সুখভোগের পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা করে, তার পরিণামকে গুরুত্ব দেয় তাহলে সুখভোগের বাসনা দূর হয়ে যাবে; কেননা কেউই দুঃখ এবং অভাবকে চায় না। স্বাভাবিকভাবেই দুঃখ এবং অভাব অরুচিকর। এই জন্যই গীতা বলেছেন—

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতম্।।

(১৮/৩৮)

'যে সুখ ইন্দ্রিয় এবং বিষয়ের সংযোগের আরম্ভে অমৃতের মতো এবং পরিণামে বিষের মতো হয়ে যায়, সেই সুখকে রাজস বলা হয়েছে।'*

তাৎপর্য হলো আরম্ভের সময় ভোগ্য পদার্থ খুবই ভাল লাগে এবং তাতে খুব সুখ অনুভূত হয়। কিন্তু সেই সুখ ভোগ করতে করতে যখন তা নীরসে পরিণত হয়ে যায় এবং তার প্রতি সম্পূর্ণ অরুচি এসে যায় তখন সেই সুখই বিষের মতো মনে হয়। বাস্তবে সুখের রুচি হল কৃত্রিম আর অরুচি স্বাভাবিক।

* রজোগুণ রাগরূপ হয়ে থাকে—'রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি' (গীতা ১৪/৭) এবং তার ফল হয় দুঃখ—'রজসস্তু ফলং দুঃখম্' (গীতা ১৪/১৬)।

যদি কেবল অপরকে সুখ দেওয়াই স্বভাব হয়ে যায় তাহলে সুখের আসক্তি সহজেই দূর হয়ে যায়। তার কারণ অ-সতের দ্বারা সুখ নেওয়ার ফলে নিজেদের মধ্যে অ-সৎকে ত্যাগ করার অসামর্থ্য এবং অ-সতের পরাধীনতা প্রতীত হয়। সেইজন্য সাধককে এটি দৃঢ় নিশ্চয় করে নিতে হবে যে তিনি অ-সতের দ্বারা সুখ নেবেনই না।

একটি মার্মিক কথা হলো এই যে ঢিলেঢালা মানুষ অর্থাৎ শিথিল স্বভাববিশিষ্ট মানুষ অ-সৎকে তাড়াতাড়ি ত্যাগ করতে পারে না। একটি কথা ভাবল এবং তাকে ছেড়ে দিল। আবার আর একটি কথা ভাবল এবং তাকেও ছেড়ে দিল। এইভাবে বার বার ভাবল এবং তাকে ছেড়ে দেওয়ার ফলে স্বভাব বিগড়ে যায়। এই বিগড়ে যাওয়া স্বভাবের ফলে অ-সৎকে ত্যাগ করার কথা শিখে নেয় কিন্তু তাকে ত্যাগ করতে পারে না। যদি একবার অ-সৎকে ত্যাগ করেও তাহলে স্বভাবের শিথিলতার জন্য আবার তাকে সত্তা দিয়ে দেয়। স্বভাবের এই শিথিলতা তো সাধকের নিজ সৃষ্ট। অতএব নিজের স্বভাবকে দৃঢ় রাখা সাধকের পক্ষে খুবই প্রয়োজন। একবার তিনি যা ভেবে নেবেন তাতে দৃঢ় থাকবেন—**'ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ'** (গীতা ৭/২৮)। ছোটখাট কথাতেও তিনি যদি দৃঢ় (অটল) থাকেন তাহলে তাঁর মধ্যে অ-সৎকে ত্যাগ করবার শক্তি এসে যাবে।

সাধকের মধ্যে একদিকে অ-সতের প্রতি রুচি (ভোগেচ্ছা) এবং অন্যদিকে সতের জন্য ক্ষুধা (জিজ্ঞাসা) থাকে। সিদ্ধান্ত হলো, অ-সতের রুচি অ-সতে নেই আর সতের জন্য ক্ষুধা সতেতে নেই। যার মধ্যে অ-সতের রুচি এবং সতের ক্ষুধা থাকে সে জীব। রুচি হলো 'কামনা' এবং 'ক্ষুধা' হলো আবশ্যকতা। কামনা কখনও পূর্ণ হয় না, বরং তার নিবৃত্তি হয়। কিন্তু আবশ্যকতা পূর্ণই হয়ে থাকে। মানুষের মধ্যে তো কেবল কামনা থাকতে পারে না, কিন্তু কেবল আবশ্যকতা থাকতে পারে। কেবল আবশ্যকতা থাকলেই তা পূর্ণ হয়ে যায়। যেমন, যতক্ষণ পর্যন্ত কাঠ থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত আগুনও থাকে। কাঠ শেষ হয়ে গেলে আগুনও শান্ত হয়ে যায়। তেমনই যতক্ষণ কামনা (ভোগেচ্ছা) থাকে ততক্ষণ আবশ্যকতা (জিজ্ঞাসা) থাকে। কামনার জন্যই আবশ্যকতা।

এইজন্য বাসনা দূর হলে আবশ্যকতাও শেষ হয়ে যায়। সেজন্য সাধকের উচিত তিনি যেন সেই আবশ্যকতার মধ্যে কামনাকে মিশিয়ে দেন, অর্থাৎ তাঁর জীবনে যেন কামনা না থাকে বরং আবশ্যকতাই থাকে। অ-সতের প্রতি রুচি যেন না থাকে, বরং সতের জন্য রুচি থাকে, সতের জন্যই ক্ষুধা থাকে। সতের জন্য যে ক্ষুধা তাকেই জিজ্ঞাসা বলা হয়। জিজ্ঞাসা এবং জিজ্ঞাস্য-তত্ত্বে কোনো ভেদ নেই। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত জিজ্ঞাসু থাকে অর্থাৎ অহং থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত জিজ্ঞাসা এবং জিজ্ঞাস্য তত্ত্বের ঐক্য স্পষ্ট হয় না। অহং দূর হলে জিজ্ঞাসু থাকে না, তখন কেবল জিজ্ঞাসাই থেকে যায়। কেবল জিজ্ঞাসা যখন থাকে তখন জিজ্ঞাসা জিজ্ঞাস্য তত্ত্বের সঙ্গে এক হয়ে যায় অর্থাৎ আবশ্যকতা পূর্ণ হয়ে যায়।

অ-সৎ নিত্যনিবৃত্ত, সেজন্য তা ত্যক্ত হয় এবং সৎ নিত্যপ্রাপ্ত সেজন্য তার সন্ধান হয়। নির্মাণ এবং সন্ধানের মধ্যে অনেক প্রভেদ। নির্মাণ সেই জিনিসেরই হয় যার আগে থেকে কোনো অস্তিত্ব নেই এবং সন্ধান সেই জিনিসেরই হয় যা আগে থেকেই বিদ্যমান। সতের অবিদ্যমানতা নেই—**'নাভাবো বিদ্যতে সতঃ'**; অতএব সতের সন্ধান হয়, নির্মাণ হয় না। সাধক যখন সতের সত্তাকে স্বীকার করে নেন তখন সন্ধান হয়। সন্ধানেরও দুটি প্রকার—এক, গলার কণ্ঠী কোথাও রেখে ভুলে গেলে নানান জায়গায় তার সন্ধান করা হয় এবং দুই, গলায় কণ্ঠী রেখে ভ্রম হয় অন্য যে সেটি হারিয়ে গেছে, তখন আমরা তাকে নানান জায়গায় খোঁজ করি। পরমাত্মতত্ত্বের সন্ধান গলায় কণ্ঠী রেখে অন্যত্র খুঁজে বেড়ানর মতো। তাৎপর্য হলো, যে পরমাত্মতত্ত্বকে আমরা চাই এবং যার সন্ধান আমরা করি সেই পরমাত্মতত্ত্ব আমাদের মধ্যেই রয়েছে। কিন্তু আমাদের মধ্যে সংসার নেই। যা আমাদের মধ্যেই থাকে তাকে সন্ধান করলে পরিণামে তাকে পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের মধ্যে যা থাকে না তার সন্ধান করলে পরিণামে তাকে পাওয়া যায় না। কেননা তার সত্তাই তো নেই।

পরমাত্মতত্ত্ব কখনও অপ্রাপ্ত নয়। তার বিস্মৃতি হয়েছে, অপ্রাপ্তি হয়নি। সেই বিস্মৃতি অনাদি এবং সান্ত (যার শেষ আছে)। যেমন, দুজন

লোক পরস্পরকে না চিনলে সেই অপরিচিতি কত দিনের সেকথা কেউ বলতে পারে না। আমরা সংস্কৃত ভাষা জানি না, এই না জানা কত দিনের তা আমরা বলতে পারি না। তাৎপর্য হলো, ব্যক্তির সত্তা, আমাদের সত্তা, সংস্কৃত ভাষার সত্তা তো আগে থেকেই আছে, কিন্তু তাদের সঙ্গে পরিচয় আগে থেকে নেই। এইভাবে বিস্মৃতির সময়েও পরমাত্মতত্ত্বের সত্তা যেমনকার তেমনই থাকে। পরমাত্মতত্ত্ব তো নিত্য প্রাপ্ত, কিন্তু তার বিস্মৃতি হয়েছে, অর্থাৎ সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়নি। তার প্রতি বিমুখতা রয়েছে, তার সঙ্গে পরিচয় নেই, তার অপ্রাপ্তির ভ্রম রয়েছে। পরমাত্মতত্ত্বের সন্ধান করলে এই বিস্মৃতি দূর হয় এবং স্মৃতি লাভ হয়ে যায়—**'নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা'** (গীতা ১৮/৭৩)।

পরমাত্মতত্ত্বের সন্ধানে অভ্যাস নেই। অভ্যাস করলে আমরা তত্ত্ব থেকে আলাদা হয়ে যাই। যখনই অভ্যাস করি তখনই আলাদা হয়ে যাই। তাই বলা হয়েছে—

শ্রুতি পুরান বহু কহেউ উপাঈ। ছূট ন অধিক অধিক অরুঝাঈ।।

(রামচরিতমানস ৭/১১৬/৬)

সাধককে যদি কিছু অভ্যাস করতেই হয় তাহলে তিনি 'আমাকে কিছুই করতে হবে না'—এই অভ্যাসটুকুই করবেন। আমাদের স্বরূপ চিন্ময় সত্তা মাত্র। সত্তাতে কখনও কিছুমাত্র শূন্যতা থাকে না। তার কারণ ভাবের অ-ভাব কি করে হতে পারে! তাই নিজেদের জন্য কখনও কোনো জিনিসেরই প্রয়োজন হয়নি, প্রয়োজন নেই, হবে না এবং হতে পারে না। সেজন্য নিজের জন্য নিজেকে কিছুই করতে হয় না। করার জন্য এবং না করার জন্য আগ্রহ থাকলে অহঙ্কার হয় এবং করা বা না করার আগ্রহ না থাকলে অহঙ্কার দূর হয়। অ-সতের সঙ্গ ছাড়া স্বরূপ কিছু করতে পারে না। তার কারণ স্বরূপে কর্তৃত্ব নেই। সমাধি অবস্থাতেও অ-সতের সঙ্গ থাকে, তার কারণ সমাধি এবং ব্যুত্থান এই দুটি অবস্থা হয়ে থাকে। কিন্তু কিছু না করলে অ-সতের সঙ্গ হয় না। আগেও কিছু ছিল না। পরেও কিছু থাকবে না। অতএব এখনও কিছু নেই—**'আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্তমানেঽপি তত্তথা'** (মাণ্ডুক্যকারিকা ৪/৩১)। কিছু না থাকাটা চিরকালের। ঘোরতম প্রবৃত্তির মধ্যেও নিবৃত্তি

নিরন্তর থাকে। এই নিবৃত্তিকে অর্থাৎ কিছু না করাকে, 'পরম বিশ্রাম' বলা হয়েছে—'**পায়ো পরম বিশ্রামু**' (রামচরিতমানস ৭/১৩০/ছং৩)। শ্রমের আদি এবং অন্ত হয়, কিন্তু বিশ্রামের আদি-অন্ত নেই। বিশ্রাম চিরকালের। শ্রমের সময়েও বিশ্রাম অপরিবর্তিত থাকে। কিন্তু আমাদের দৃষ্টি থাকে শ্রমের দিকে, বিশ্রামের দিকে দৃষ্টি যায় না। অ-সৎকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করলে নিত্যপ্রাপ্ত বিশ্রাম প্রাপ্ত হয়ে যায়।

বাস্তবে অ-সৎকে ত্যাগ করার মধ্যেই সতের সন্ধান নিহিত। জ্ঞানও অ-সতেরই হয়, সতের হয় না। অ-সৎকে অ-সৎ রূপে জানাই হলো জ্ঞান। জ্ঞানের ফলে অ-সতের নিবৃত্তি হয়ে যায় এবং সৎ যেমনকার তেমন অবশিষ্ট থেকে যায়। কারণ সৎ নিত্যপ্রাপ্ত। অ-সতের উপর অর্পিত সত্তা এবং গুরুত্বই নিত্যপ্রাপ্ত সতের উপলব্ধিতে বাধা। অতএব সতের প্রাপ্তি তো স্বতঃসিদ্ধ, অ-সৎকে ত্যাগ করার মধ্যেই ন্যূনতা থাকে। সতের প্রাপ্তি হয় না, প্রত্যুত অ-সতেরই নিবৃত্তি হয়। অ-সতের সত্তা কল্পিত, তার কোনো মূল আধার নেই। অতএব অ-সৎ-এর ত্যাগ স্বতঃই হয় এবং তা সহজ ও শ্রেষ্ঠ। এতে একটি মার্মিক কথা হলো এই যে বাস্তবে অ-সৎকে ত্যাগ করতে হয় না, বরং অ-সতের অবিদ্যমানতাকেই উপলব্ধি করতে হয়—'**নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ**' (গীতা ২/১৬) 'অ-সতের সত্তা বিদ্যমান নেই'। কারণ ত্যাগ করলে অহং (ত্যাগী) অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু অবিদ্যমানকে স্বীকার করলে অহং অবশিষ্ট থাকবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত অহংরূপী অণু থাকবে ততক্ষণ অ-সতের সঙ্গ থাকবে। অ-সৎকে যথার্থ ত্যাগ, অহংরূপী অণুর বিনাশ হলেই হতে পারে।

স্বরূপে অহং নেই। অহং-রহিত স্বরূপের বোধই প্রকৃত বোধ। অহং-রহিত স্বরূপের বোধ হওয়ার জন্য দুটি যুক্তি খুবই কাজের—

(১) সুষুপ্তিতে অহং থাকে না, কিন্তু স্বরূপ থাকে। অতএব সুষুপ্তির সময় সকলের অহং-এর অবিদ্যমানতা এবং স্বরূপের বিদ্যমানতা অনুভূত হয়। তার স্পষ্ট বোধ হয় জেগে ওঠার পর। যথা, জেগে ওঠার পর আমরা বলি 'আমি এমন ঘুমিয়েছি যে কিছুই মনে নেই' কিন্তু 'কিছুই মনে নেই' এইটি তো মনে আছে। অতএব 'কিছু মনে নেই'—এটি

হলো অহং-এর না থাকা আর এই জ্ঞান যার, সে হলো অহং-রহিত স্বরূপ।

(২) জীব যখন অনেক যোনিতে যায় তখন যোনির পরিবর্তন হয়। শরীর বদলায়, কিন্তু স্বয়ং সেই একই থাকে। ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে অহং ও ভিন্ন ভিন্ন থাকে; কিন্তু স্বয়ং-এর সত্তা সকল যোনিতে একই থাকে।

'আমি আছি'—এটি হলো অহং-সহ সত্তা আর 'আছে' এটি হলো অহং-রহিত্ সত্তা। সাধকের উচিত তিনি 'আমি আছি'-কে না লক্ষ্য করে 'আছে'-তে অবস্থিত থাকবেন। 'আমি' (অহং) তো 'তুমি', 'এইটি' এবং 'ঐটি' হয়ে যায় কিন্তু 'আছে' সর্বদা 'আছে'-ই থাকে। তাৎপর্য হলো 'আমি' পরিবর্তিত হয় কিন্তু 'আছে' সর্বদা যেমনকার তেমনই থাকে। তবে যতক্ষণ 'আমি' থাকে ততক্ষণ 'আছে'-র অনুভূতি হয় না। 'আছি'-তে 'আমি' (অ-সত-এর) অংশও আছে আবার 'আছে' (সৎ)-এর অংশও আছে। কিন্তু 'আমি'-র প্রাধান্য হওয়ার ফলে 'আছে' গৌণ হয়ে যায়। তাৎপর্য হলো 'আমি'-র সংস্কার প্রধান হওয়ায় অন্তঃকরণে 'আমি' ব্যাপ্ত হয়ে থাকে। তাতে 'আছে' অনুভূত হয় না। শুধু তাই নয় 'আমি'-র প্রাধান্য হওয়ায় 'আছে'-ও 'আমি'-র আশ্রিত বলে মনে হয়। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। সাধক যখন এটি অনুভব করেন যে 'আমি' একদেশীয় (পরিচ্ছিন্ন), দৃশ্য (যাকে দেখা যায়) এবং জ্ঞেয় (যাকে জানা যায়) তখন আকাশে তারার মতো 'আমি' ক্ষীণ হয়ে যায় অর্থাৎ 'আমি'-র প্রাধান্য নষ্ট হয়ে যায়। প্রাধান্য নষ্ট হলে 'আমি' গৌণ হয়ে যায় এবং 'আছে' মুখ্য হয়ে যায়। 'আছে' প্রধান হয়ে গেলে 'আমি'-র কৃত্রিম সত্তা লুপ্ত হয়ে যায়। কেননা যা ক্ষীণ তা নশ্বর—**'যদল্পং তন্মর্ত্যম্** (ছান্দোগ্য০ ৭/২৪/১)। 'আমি' দূর হলে 'আছি' 'আছে'-তে পরিণত হয়ে যায়, যা আগে থেকেই আছে—

তেরা সাহিব হৈ ঘট মাঁহী, বাহর নৈনা ক্যোঁ খোলে।
কহত কবীর সুনো ভাঈ সাধো, সাহিব পায়া তৃণ-আোলে।।

'আমি'-ই তৃণ যার আবরণে 'আছে' লুকিয়ে আছে। এই রকম অহং রহিত স্বরূপের সাক্ষাৎকারকেই উপনিষদ্ বলেছে—

আত্মানং চেদ্ বিজানীয়াৎ অয়মস্মীতি পূরুষঃ।

(বৃহদারণ্যক ৪/৪/১২)

এই অহংরহিত চিন্ময় সত্তায় দেশ, কাল, ঘটনা, পরিস্থিতি, অবস্থা কিছুই নেই। না আছে জড়, না চেতন, না স্থাবর, না জঙ্গম, না লোক, না পরলোক, কিছুই নেই। কেবল আছে চিন্ময় সত্তা। এই চিন্ময় সত্তায় সকলের স্বতঃ-স্বাভাবিক স্থিতি। সত্তাতে স্বতঃ-স্বাভাবিক স্থিতিকেই পরম বিশ্রাম, সহজ সমাধি, সহজাবস্থা * প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়েছে। সহজাবস্থা স্বতঃ-সিদ্ধ। তাতে প্রয়াস নেই, অ-প্রয়াসও নেই। কিছু করা নেই, কিছু না-করা নেই; সংযোগ নেই, বিয়োগ নেই; ভাব নেই, অ-ভাব নেই; স্থিরতা নেই, চাঞ্চল্য নেই; আগমণ নেই, প্রত্যাগমণ নেই। এই সহজাবস্থা কখনও তৈরী হয় না। কখনও বিগড়েও যায় না। মহাপ্রলয় হোক, মহাসর্গ হোক, কোটি কোটি ব্রহ্মা বিগত হোক, সহজাবস্থা যেমনকার তেমনই থাকে—

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ।।

(গীতা ১৪/২)

'এই জ্ঞানকে আশ্রয় করে যে মানুষ আমার সধর্মতাকে লাভ করেছেন তিনি মহাসর্গেও উৎপন্ন হন না এবং মহাপ্রলয়েও ব্যথিত হন না।'

ভগবান খুবই মার্মিক কথা বলেছেন—

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।

(গীতা ২/১৬)

'অ-সতের সত্তা বিদ্যমান নেই অর্থাৎ অ-সৎ সদাসর্বদা নিবৃত্ত এবং সৎ-এর অবিদ্যমানতা বিদ্যমান নেই অর্থাৎ সৎ সদা-সর্বদা প্রাপ্ত।'

একমাত্র সৎ-তত্ত্বেরই সত্তা আছে। অ-সতের সত্তাইনেই। কেবল সৎ-ই আছে, অ-সৎ নেই। যা নিরন্তর পরিবর্তিত হচ্ছে এবং বিনাশের দিকে যাচ্ছে সেই অ-সতের সত্তা কি করে হতে পারে? যা কিছু সত্তা

*বাস্তবে সহজাবস্থা কোনো অবস্থা নয়, কিন্তু সেই তত্ত্বকে বোঝবার জন্য নিজের ভাষায় সহজাবস্থা বলা হয়। আসলে ভাষা ঐ পর্যন্ত পৌঁছায় না।

এবং মহত্ব দৃষ্ট হয় তা সবই সৎ-এর কারণে। একটি মার্মিক কথা হলো সৎ-ই অ-সৎকে সত্তা দেয়। কারণ সৎ অ-সতের বিরোধী নয়, প্রত্যুত সৎ-এর জিজ্ঞাসাই হলো অ-সতের বিরোধী। এইজন্য জ্ঞানী মহাপুরুষ অজ্ঞানীকে দ্বেষ করেন না। বরং তাকে সমাদর করেন। ব্রহ্মা ভগবানকে বলেছেন—

তস্মাদিদং জগদশেষমসৎস্বরূপং
স্বপ্নাভমস্তধিষণং পুরুদুঃখদুঃখম্।
ত্বয্যেব নিত্যসুখবোধতনাবনন্তে
মায়াত উদ্যদপি যৎ সদিবাবভাতি।।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১০/১৪/২২)

'এই সমগ্র জগৎ স্বপ্নের মতো অসত্য, অজ্ঞানরূপ এবং ক্রমাগত দুঃখদায়ী। আপনি পরমানন্দ, জ্ঞানস্বরূপ তথা অনন্ত। এটি মায়ার দ্বারা সৃষ্ট এবং মায়াতে বিলীন হওয়ার পরও আপনাতে আপনার সত্তার দ্বারা সত্য বলে প্রতীত হয়।'

যদি অ-সৎ (সৃষ্টি)-এর সত্তাকে মানেন তাহলেও তার সনাতন তথা অব্যয় বীজ* হলো সৎ—

বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।

(গীতা ৭/১০)

প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্।।

(গীতা ৯/১৮)

যদি অ-সতের সত্তা না মানেন তাহলে তার বীজও থাকে না, প্রত্যুত কেবল সৎ-ই থাকে—**'বাসুদেবঃ সর্বম্'**।

সৎ তত্ত্বে আকর্ষণ নেই, বিকর্ষণও নেই; বৈরাগ্য নেই, আসক্তিও নেই; সকামভাব নেই, নিষ্কামভাবও নেই; পূর্ণতা নেই, অপূর্ণতাও নেই;

---

*বীজ বৃক্ষ থেকে উৎপন্ন হয় এবং বৃক্ষকে উৎপন্ন করে স্বয়ং নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু পরমাত্মায় এই দুটি দোষ নেই—একথা জানাবার জন্য 'সনাতন' (৭/১০) এবং 'অব্যয়' (৯/১৮) এই দুটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। তাৎপর্য হলো 'সনাতন' হওয়ায় পরমাত্মা উৎপন্ন হন না এবং 'অব্যয়' হওয়ায় পরমাত্মা অনন্ত সৃষ্টিকে উৎপন্ন করেও স্বয়ং যেমনকার তেমন থাকেন।

কেবল সৎ-ই আছে। আকর্ষণ-বিকর্ষণ, বৈরাগ্য-আসক্তি প্রভৃতি সবই সাপেক্ষ, কিন্তু তত্ত্ব নিরপেক্ষ। সেজন্য সাধকের দৃষ্টি সৎ-এর দিকেই থাকা উচিত। যার সত্তাই নেই তার দিকে আর কী দেখবেন?

যখন সৎ ছাড়া আর কিছুই নেই তখন তার অভ্যাস কী করবেন? চিন্তাই বা কী করবেন? এতে কিছু করার নেই। কিছু চিন্তনের নেই, কিছু নিশ্চয় করার নেই, কিছু প্রাপ্ত করার বা কিছু নিবৃত্ত করারও নেই। অতএব অ-সতের নিবৃত্তি করতে হবে না, কেননা অসৎ নিত্যনিবৃত। আর সৎ-কে প্রাপ্ত করতে হবে না, কেননা সৎ সদা-সর্বদা প্রাপ্ত। এই রকম চিন্তা করে মৌন হয়ে যান, কোনো কিছু চিন্তা করবেন না। সংসারের চিন্তা করবেন না, পরমাত্মার কথাও চিন্তা করবেন না; কেননা চিন্তা করলে আমরা সংসারের সঙ্গে জুড়ে যাব আর পরমাত্মা থেকে দূরে সরে থাকব। তাই চিন্তন করতে হবে না। প্রত্যুত চিন্তন করবার শক্তি যার দ্বারা প্রকাশিত হয় তার মধ্যে স্বতঃসিদ্ধ স্থিতির উপলব্ধি করতে হবে। বৃত্তিগুলিকে যে জ্ঞানের অন্তর্গত দেখা যায় সেই জ্ঞানের মধ্যে স্বতঃসিদ্ধ স্থিতিকে অনুভব করতে হবে। নিজে থেকেই যদি চিন্তন, স্ফূরণ এসে যায় তো সেদিকে দৃষ্টি না দিয়ে সেগুলিকে উপেক্ষা করুন। যেমন জল স্থির (শান্ত) হয়ে গেলে তাতে মিশ্রিত মাটি নিজে থেকেই নিচে পড়ে যায়, সেইভাবে মৌন হয়ে গেলে সমস্ত বিকার নিজে থেকেই শান্ত হয়ে যায়। অহং বিগলিত হয় এবং বাস্তবিক তত্ত্ব (অহংরহিত) সত্তার অনুভূতি এসে যায়।

❁ ❁ ❁

(৫) সহজ নিবৃত্তি এবং স্বতঃপ্রাপ্তি

সাধক যা করতে চান তা স্বতঃই হয়ে যাচ্ছে! যথা, তিনি সংসারের নিবৃত্তি করতে চান, তো সংসারের সহজ নিবৃত্তি সদাই হয়ে চলেছে। তিনি পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করতে চান তো পরমাত্মা স্বতঃপ্রাপ্ত।

একটি বিভাগ হলো জড় প্রকৃতির (শরীর তথা সংসারের) এবং অপর বিভাগটি হলো চেতন তত্ত্বের (জীবাত্মা তথা পরমাত্মার)। প্রকৃতির সহজ-নিবৃত্তি এবং তত্ত্বের স্বতঃ-প্রাপ্তি রয়েছে।

প্রকৃতিতে নিরন্তর পরিবর্তনরূপ ক্রিয়া হয়ে চলেছে। প্রকৃতি কোনো অবস্থাতেই অক্রিয় নয়। প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি অথবা সর্গ-মহাসর্গ এবং প্রলয়-মহাপ্রলয়—দুটি অবস্থাতেই প্রকৃতির ক্রিয়াশীলতা (সহজনিবৃত্তি) যেমনকার তেমন থাকে। সুতরাং তার প্রতীতি তো হয় কিন্তু প্রাপ্তি হয় না। তাৎপর্য হলো এই যে নিজের শরীর তথা স্ত্রী-পুত্র, ধন, জমি, বাড়ি প্রভৃতি আগেও আমাদের কাছে ছিল না, পরেও আমাদের কাছে থাকবে না এবং এখনও তার সর্বদা আমাদের থেকে বিচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তত্ত্বের প্রাপ্তি স্বতঃই রয়েছে, কেননা আমাদের সঙ্গে তার কখনও বিচ্ছেদ হয় না। যথা, সকলেই এটি অনুভব করেছেন যে ছোটবেলায় আমাদের শরীর যেমন ছিল এখন সেরকম নেই। সম্পূর্ণরূপে সেই শরীরের পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে আর এখনও তা হচ্ছে। কিন্তু আমরা সেই একই আছি, যেমন ছোটবেলায় ছিলাম। সুতরাং সর্বদা যার বিচ্ছেদ হচ্ছে সে অ-সৎ, আর যার সহজ নিবৃত্তি হয় এবং যা তাই থাকে, কখনও বিচ্ছেদ হয় না তা সৎ এবং তার স্বতঃ প্রাপ্তি রয়েছে।

অ-সতের সহজ নিবৃত্তি হয় অর্থাৎ তার নিবৃত্তি করতে হয় না। প্রত্যুত তার স্বতঃ নিত্য-নিরন্তর নিবৃত্তি হচ্ছে। এই সহজ নিবৃত্তি স্বতঃ সিদ্ধ। এই সহজ-নিবৃত্তি কখনও অবিদ্যমান হয় না। এতে কখনও বাধা পড়ে না। এতে কখনও বিশ্রাম হয় না।

পৃথিবী যেমন তার অক্ষের উপর নিরন্তর ঘুরছে, তেমনই যে সংসারকে দেখা-শোনা-বোঝা যায় সেই সংসারের নিরন্তর নিবৃত্তি হচ্ছে। সমগ্র সংসার নিরন্তর অবিদ্যমানতার দিকে যাচ্ছে। সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় হোক; জন্ম, জীবন, মৃত্যু হোক; বাল্য, যৌবন, বৃদ্ধাবস্থা হোক; সহজনিবৃত্তি যথাপূর্ব থেকে যায়। ঘোরতম প্রকৃতিতেও সহজ নিবৃত্তি যেমনকার তেমনই থাকে, তার আভাস না পাওয়া গেলেও।

সৎ স্বতঃপ্রাপ্ত। সৎ কখনও অপ্রাপ্ত হয়নি, অপ্রাপ্ত হয় না, অপ্রাপ্ত হবে না, অপ্রাপ্ত হওয়া সম্ভবও নয়। তা সকল দেশ, কাল, পাত্র, বস্তু, অবস্থা, পরিস্থিতি, ঘটনা প্রভৃতিতে সম্পূর্ণরূপে পরিব্যাপ্ত। সৎ স্বতঃই প্রাপ্ত, তার জন্য কিছুই করতে হয় না। প্রচণ্ডতম জ্ঞানী, ভীষণতম অজ্ঞানী অথবা পুণ্যাত্মা, তত্ত্বজ্ঞ, জীবন্মুক্ত, ভগবৎপ্রেমী মহাপুরুষ—এদের কারও কাছে সৎ (স্বতঃপ্রাপ্ত তত্ত্ব) অপ্রাপ্ত নয়। পার্থক্য শুধু এইটুকুই যে অজ্ঞানী তাকে অনুভব করতে পারে না, কিন্তু জ্ঞানী তাকে উপলব্ধি করেন। প্রাপ্তকে অপ্রাপ্ত আর অপ্রাপ্তকে প্রাপ্ত মেনে নেওয়ার ফলেই স্বতঃপ্রাপ্ত (তত্ত্ব) অনুভূতিতে আসে না।

যার নিরন্তর সহজনিবৃত্তি হয় তার সুখ লোলুপতাপূর্বক আকর্ষণই স্বতঃ-প্রাপ্তকে অনুভব করার ক্ষেত্রে প্রধান বাধা। আকর্ষণের কারণ হলো অ-সতের সত্তা এবং গুরুত্ব, যা আমাদেরই প্রদত্ত। আমরা যদি অ-সৎকে সত্তা এবং গুরুত্ব না দিই তাহলে আমাদের তার দিকে আকর্ষণ করবার শক্তিই তার থাকে না। যেমন, আগে কিছু ভোগ করে থাকলে তার স্মরণ হলে সুখ হয় এবং আগের দুঃখ মনে পড়লে দুঃখের অনুভূতি হয়। সুখ-দুঃখের সেই ভোগ এখন নেই, বর্তমানে তা সম্পূর্ণরূপে অবিদ্যমান, তবু তার কথা চিন্তা করলে সুখ অথবা দুঃখ হয়। তাতে প্রমাণিত হয় যে যা অবিদ্যমান তাকে আমরা সত্তা এবং গুরুত্ব দিয়েছি। যদি আমরা সত্তা এবং গুরুত্ব না দিতাম তাহলে বর্তমানে যার অস্তিত্ব নেই সেই অতীতের চিন্তায় আমাদের সুখ কিংবা দুঃখ হোত না।

অতীতের বস্তু যেমন বর্তমানে অপ্রাপ্ত তেমনই বর্তমানে যে বস্তু পাওয়া গিয়েছে তাও অপ্রাপ্ত। প্রাপ্ত বস্তুর নিরন্তর বিচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে।

যেমন অতীত কালের কথা মনে এল এবং ভুলে যাওয়া হলো তেমনই বর্তমান কালের বস্তু পেয়ে গেলাম এবং তার সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে গেল—এই দুটির মধ্যে পার্থক্য কোথায়? তার প্রাপ্তি সিদ্ধ হয় না, প্রত্যুত তার নিবৃত্তিই সিদ্ধ হয়।

নিয়ম হলো, কোনো কিছু যদি এক জায়গায় অপ্রাপ্য হয় তাহলে তা সব জায়গাতেই অপ্রাপ্য, যদি কোনো কিছু একটি সময়ে অপ্রাপ্য হয় তাহলে তা সদা-সর্বদা অপ্রাপ্য। যদি কোনো মানুষের কাছে কিছু অপ্রাপ্য হয় তাহলে তা সব মানুষের কাছে অপ্রাপ্য। যদি কোনো অবস্থাতে কিছু অপ্রাপ্য হয় তাহলে তা সকল অবস্থাতেই অপ্রাপ্য। যদি কোনো পরিস্থিতিতে কিছু অপ্রাপ্য হয় তাহলে সব পরিস্থিতিতেই তা অপ্রাপ্য। তাৎপর্য হলো, যা কোনো দেশ, কাল, পাত্র, বস্তু, অবস্থা, পরিস্থিতিতে অপ্রাপ্য, তা কোথাও প্রাপ্ত নয়; কেননা প্রাপ্ত নিরন্তর বিযুক্ত হয়ে যাচ্ছে। অতএব সংসার কখনও প্রাপ্ত হয়নি, প্রাপ্ত নয়, প্রাপ্ত হবে না, প্রাপ্ত হওয়া সম্ভবও নয়। যার নিরন্তর সহজ নিবৃত্তি হয় তা প্রাপ্ত কি করে হতে পারে?

সংসারে অনুরাগ হওয়ায় সহজনিবৃত্তিকেও প্রবৃত্তির মতো দেখায়, অপ্রাপ্তও প্রাপ্ত বলে দৃষ্ট হয়। যেমন আমাদের বয়স প্রতিমুহূর্তে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, শরীরের প্রতি মুহূর্তে মৃত্যু হচ্ছে; কিন্তু অ-সতের প্রতি অনুরাগবশত আমরা দেখি যে আমরা (শরীরে) বেঁচে রয়েছি।

অ-সতের প্রতি অনুরাগের জন্যই একথা বলতে হয় যে সহজনিবৃত্তি নিরন্তর হচ্ছে। বাস্তবে সংসার সহজনিবৃত্ত, স্বতঃনিবৃত্ত, নিত্যনিবৃত্তই। ভগবান বলেছেন—

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।।

(গীতা ২/১৬)

'অ-সতের ভাব বিদ্যমান নেই এবং সতের অ-ভাব বিদ্যমান নেই। তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষেরা এই দুটিরই শেষ দেখেছেন'।

যা নিবৃত্ত, তা 'অ-সৎ' এবং তা কখনও প্রাপ্ত হয় না। যা প্রাপ্ত তা 'সৎ' এবং তা কখনও নিবৃত্ত হয় না। নিবৃত্তির নিত্যবিয়োগ এবং প্রাপ্তের

নিত্যযোগ আছে। অ-সৎ কেবলই অস্তিত্বহীন এবং এই অবিদ্যমানতার কখনও অ-ভাব (নাশ) হয় না। সতের কেবলই ভাব আর এই ভাবের কখনও অ-ভাব হয় না। অ-সৎ অ-সৎই এবং সৎ কেবলই সৎ। অ-সৎ একেবারেই নেই, আছে কেবল সৎ। তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষেরা সৎ এবং অ-সৎ দুটিরই তত্ত্ব দেখেছেন। তাৎপর্য হলো সতের তত্ত্বও সৎ এবং অ-সতের তত্ত্বও সৎ। অর্থাৎ দুটির তত্ত্ব সৎ (সত্তামাত্র)-ই।

অ-সৎকে সত্তা দিলেই নিবৃত্ত (সহজনিবৃত্ত) এবং প্রাপ্ত (স্বতঃ প্রাপ্ত)—এই দুটি বিভাগের কথা বলা হয়। অ-সৎকে সত্তা না দিলে নিবৃত্তও নেই, প্রাপ্তও নেই বরং কেবল সত্তাই থাকে। অন্য কথায়, যতক্ষণ অ-সতের সত্তা থাকে ততক্ষণ বিবেক থাকে। অ-সতের সত্তা দূর হলে বিবেকই তত্ত্বজ্ঞানে পরিণত হয়ে যায়। কেননা যখন অ-সতের সত্তাই নেই তখন অবশিষ্ট তো সৎ-ই থেকে যায়। এই জন্য গীতা **'বাসুদেবঃ সর্বম্'** বলেছেন।

যেমন আছে তাকে তেমন জেনে নেওয়ার নাম জ্ঞান। যার স্বরূপ যথার্থ না জেনে অন্য প্রকারের ধারণা করা—একেই বলা হয় অজ্ঞান। যেমন— সংসারের সর্বদাই সহজনিবৃত্তি হয়ে চলেছে—এটি অনুভব করা হল জ্ঞান এবং সংসার প্রাপ্ত রয়েছে—এটি মনে করা হল অজ্ঞান। পরমাত্মতত্ত্ব স্বতঃ-প্রাপ্ত—এটি জানা হলো জ্ঞান এবং পরমাত্মতত্ত্ব অপ্রাপ্ত এটি মনে করা অজ্ঞান। সুতরাং সাধকের কাছে প্রধান কথাটি হলো, 'সংসারের নিরন্তর সহজনিবৃত্তি হচ্ছে এবং তত্ত্ব সকলের কাছে স্বতঃপ্রাপ্ত'—এই জ্ঞানকে (বিবেক-কে) গুরুত্ব দেওয়া। গুরুত্ব দিলে এই জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান পর্যন্ত পৌঁছে যাবে এবং অজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে যাবে।

প্রশ্ন—সংসারের নিরন্তর সহজনিবৃত্তি হচ্ছে—এটি তো স্পষ্ট দেখা যায়, কিন্তু তত্ত্ব স্বতঃপ্রাপ্ত এটি দেখা যাবে কি করে?

উত্তর—যে জ্ঞানের দ্বারা সহজনিবৃত্তিকে দেখা যায় সেই জ্ঞান নিরন্তর স্বতঃপ্রাপ্ত। তার কারণ যার সর্বদা নাশ হচ্ছে—তাকে নশ্বর দেখতে পারে না, প্রত্যুত যে থাকে সেই দেখতে পারে। বিনাশী সম্পর্কে অনুভূতি বিনাশীর হতে পারে না, সেই অনুভূতি অবিনাশীরই

হতে পারে। পরিবর্তনশীলতা সম্পর্কে অনুভূতি যে পরিবর্তনশীল, তার হতে পারে না ; যে অপরিবর্তনশীল তারই হতে পারে। সীমিত সম্পর্কে জ্ঞান যে নিজে সীমিত তার হতে পারে না, যে অসীম তার হতে পারে।

জ্ঞাতার বিভাগ এবং যা জ্ঞাত হয় তার বিভাগ আলাদা। জ্ঞাতা 'সৎ' এবং জ্ঞেয় 'অসৎ'। অপরিবর্তনীয় 'সৎ' এবং পরিবর্তনশীল 'অ-সৎ'। অতএব যার দ্বারা সহজনিবৃত্তি দৃষ্ট হয় সেইটিই স্বতঃপ্রাপ্ত এবং সেইটিই আমাদের স্বরূপ।

দ্রষ্টা 'অস্তি' এবং দৃশ্য 'নাস্তি'। এইজন্য বলা হয়েছে—

হৈ সো সুন্দর হৈ সদা, নহিঁ সো সুন্দর নাহিঁ।
নহিঁ সো পরগট দেখিয়ে, হৈ সো দীখে নাহিঁ।।

'নাস্তি'-কে 'অস্তি' মেনে নিলে দৃষ্টি 'নাস্তি-তে আটকে যায়, 'অস্তি' পর্যন্ত পৌঁছায় না। তাহলে 'অস্তি'-কে কি করে দেখবে? সেজন্য সাধকের উচিত তিনি যে জ্ঞানের মধ্যে 'নাস্তি'-কে দেখেন সেই জ্ঞানে স্থির অর্থাৎ মৌন হয়ে যান। তাহলে এখন যা দেখা যাচ্ছে না তা দেখতে পাওয়া যাবে।

সংসারে নানা রকমের ক্রিয়া হচ্ছে, ব্যবহার হচ্ছে, পরিবর্তন হচ্ছে। কিন্তু এইগুলি যার ভিতরে হচ্ছে, সেই 'অস্তি'-তে ক্রিয়া, ব্যবহার, পরিবর্তন প্রভৃতি কিছুই নেই। সেই নিত্য সত্তা (অস্তি) যেমনকার তেমনই থাকে। কেউ জন্মাচ্ছে, কারও মৃত্যু হচ্ছে, কেউ আসছে, কেউ যাচ্ছে, কেউ হাসছে, কেউ কাঁদছে; কেউ সুখী, কেউ দুঃখী; কেউ ক্রুদ্ধ, কেউ শান্ত; কেউ ভোগে লিপ্ত, কেউ যোগে মগ্ন; কেউ কথা বলছে, কেউ চুপ করে আছে; কেউ জেগে আছে, কেউ আছে ঘুমিয়ে। কিন্তু এই সবের মধ্যে একই সত্তা সমানরূপে পূর্ববৎ পরিপূর্ণ রয়েছে। সেই সত্তায় কখনও বিন্দুমাত্র কোনো পরিবর্তন হয় না। সেইজন্য মর্যাদাপূর্বক সব ব্যবহার করতে থাকলেও সাধকের দৃষ্টি সমরূপ সত্তার প্রতিই থাকা উচিত। গীতায় বলা হয়েছে—

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।।

(গীতা ৫/১৮)

'জ্ঞানী মহাপুরুষ বিদ্য-বিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণে এবং চণ্ডালে তথা গরু, হাতি এবং কুকুরেও সমরূপ পরমাত্মতত্ত্বকে দেখেন।'

সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎ স্ববিশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।।

(১৩/২৭)

'বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে এমন সমস্ত প্রাণীর মধ্যে যিনি পরমাত্মাকে অবিনাশী এবং সমরূপে স্থিত দেখেন, তিনিই বাস্তবে যথার্থ দ্রষ্টা।'

এই নিত্য সত্তাই কর্মযোগের দৃষ্টিতে 'অকর্ম', জ্ঞানযোগের দৃষ্টিতে 'আত্মা' এবং ভক্তিযোগের দৃষ্টিতে 'ভগবান'। এইজন্য কর্মযোগী কর্মে অকর্ম এবং অকর্মে কর্মকে দেখেন—

কর্মন্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ।

(গীতা ৪/১৮)

জ্ঞানযোগী সকল প্রাণীর মধ্যে আত্মাকে এবং আত্মাতে সকল প্রাণীকে দেখেন—

সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।

(গীতা ৬/২৯)

ভক্তিযোগী সব কিছুর মধ্যে ভগবানকে এবং ভগবানের মধ্যে সবকিছুকে দেখেন—

যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্ব চ ময়ি পশ্যতি।

(গীতা ৬/৩০)

তাৎপর্য হলো কর্মযোগী সকল কর্মে অকর্ম (কর্মের সঙ্গে সম্বন্ধের অবিদ্যমানতা অর্থাৎ নির্লিপ্ততা)-কেই দেখেন (অনুভব করেন), জ্ঞানযোগী সকল প্রাণীর মধ্যে এক আত্মাকেই দেখেন আর ভক্তিযোগী সব কিছুর মধ্যে এক ভগবানকেই দেখেন। কর্মযোগী কর্ম এবং কর্মফলের সঙ্গে সম্বন্ধ না রেখে কেবল অন্যের হিতের জন্য কর্ম করেন, সেজন্য তাঁর কর্মের সঙ্গে সম্বন্ধের অস্তিত্বহীনতা অর্থাৎ নির্লিপ্ততার অনুভূতি হয়ে যায়। যেমন, মনে কখনও হরিদ্বারের চিন্তা উদিত হয়, কখনও বা কলকাতার চিন্তা উদিত হয় এবং মনে সেখানকার ভিন্ন ভিন্ন বস্তু, প্রাণী প্রভৃতি দৃষ্ট হতে থাকে। কিন্তু এই সবকিছুই মনেরই সৃষ্টি।

মনোরাজ্যে এক মন ছাড়া আর কোনো প্রাণী-পদার্থের সত্তা নেই। তেমনভাবে জ্ঞানযোগীর দৃষ্টিতে এক আত্মা ছাড়া অন্য কোনো কিছুর স্বতন্ত্র সত্তা থাকে না। যেমন ব্রহ্মা গোপবালক এবং গোবৎসদের চুরি করলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই গোপবালক, গোবৎস প্রভৃতি অনেক রূপ পরিগ্রহ করেন। ভগবানের এই লীলা কেউই জানতে পারেনি। একদিন গরুগুলির বাছুরগুলির প্রতি এবং গোপদের তাদের বালকদের প্রতি অপূর্ব স্নেহ দেখে বলরামের সংশয় হলো। তখন তিনি দেখলেন যে ভগবানই গোপবালক ও গোবৎস রূপ নিয়েছেন। এইভাবে ভক্তিযোগী সকল রূপের মধ্যে ভগবানকেই দেখেন অর্থাৎ তাঁর দৃষ্টিতে এক ভগবান ছাড়া আর কারও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না।

অকর্ম বলুন, আত্মা বলুন আর ভগবানই বলুন—তত্ত্বগতভাবে তিনটি একই (বোধস্বরূপ সত্তামাত্র)। সেই চিন্ময় সত্তা (অস্তি)-এর দিকে লক্ষ্য চলে যাওয়াই হলো তার প্রাপ্তি। এর পর কোনো দোষ, বিকার দেখা গেলে সাধকের ঘাবড়ান উচিত নয়। সাপকে দেখে আমরা যেমন ভয় পাই কিন্তু যখনই আমরা বুঝতে পারি যে এ হলো দড়ি, তাহলে দড়ি বুঝতে পারার পরও কিছুক্ষণ ভয়ের প্রভাব থাকে, হাত পা কাঁপতে থাকে, বুক ধড়ফড় করতে থাকে। কিন্তু এই কাঁপুনি এবং ধড়ফড়ানি নিজে থেকেই শান্ত হয়ে যায়। তেমনই সাধকের দৃষ্টি যদি এক 'অস্তি'-র দিকেই থাকে তাহলে সব বিকার নিজে থেকেই শান্ত হয়ে যাবে। ঐ 'অস্তি' এমন ভরাট যে তার মধ্যে কোনো দ্বিতীয় জিনিস প্রবেশ করতে পারে না। তার মধ্যে কোনো সংশয় প্রভৃতির স্থান নেই। যখন তার দিকে আমাদের দৃষ্টি ছিল না তখনও 'অস্তি' যেমনকার তেমনই পরিপূর্ণ ছিল এবং এখন সেদিকে দৃষ্টি গেলেও তা যথাপূর্বং পরিপূর্ণই—

দৌড় সকে তো দৌড় লে, জব লগি তেরী দৌড়।
দৌড় থক্যা ধোখা মিঠ্যা, বস্তু ঠৌড়-কী-ঠৌড়।।

অর্জুন এই কথাই বলেছেন—'নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা' (গীতা ১৮/৭৩) 'আমার মোহ নষ্ট হয়ে গিয়েছে তথা স্মৃতি প্রাপ্ত হয়ে গিয়েছে।'

ভুল দূরীভূত হওয়ার নাম হলো 'স্মৃতি'। ভুল তা নিয়ে হতে পারে যেটি সম্পর্কে আমরা জানি এবং এই জানার অন্তর্গতই সেটি প্রকাশিত হয়। যার সত্তা বিদ্যমান নেই তাকে বিদ্যমান মনে করাই ভুল। ভুলকে ভুল বলে চিনতে পারলেই ভুল দূর হয়ে যায় এবং স্মৃতি প্রাপ্ত হয়। এই স্মৃতির আর কখনও বিস্মৃতি হয় না **'যজ্জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।'** (গীতা ৪/৩৫)। তার কারণ স্মৃতি অর্থাৎ বোধ একবারই হয় আর তা হয় চিরকালের জন্য। তাৎপর্য হলো বোধের আবৃত্তি হয় না। বোধ যদি একবার অনুভূতিতে, দৃষ্টিতে এসে যায় তাহলে তা চিরকালের জন্য হয়ে যায়। বাস্তবে বোধের অ-ভাব বিদ্যমানই নেই অর্থাৎ বোধ স্বতঃপ্রাপ্ত এবং তার জ্ঞাতা অন্য কেউ নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত অন্য কেউ বোধের জ্ঞাতা থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত বাস্তবে বোধ হয় না। স্বয়ং বোধস্বরূপ এবং স্বয়ং-ই তার জ্ঞাতা। ভগবানের সম্পর্কে অর্জুন এই কথাই বলেছেন—**'স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম'** (গীতা ১০/১৫) 'হে পুরুষোত্তম! আপনি স্বয়ং নিজেই নিজের দ্বারা নিজেই নিজেকে জানেন।'

প্রশ্ন—বোধ স্বতঃপ্রাপ্ত কেমন করে?

উত্তর—এটি প্রত্যক্ষ অনুভূতির বিষয় যে বিনাশীকে আমরা জানি, বিনাশশীল আমাদের জানার মধ্যে আসে। 'অহং' আমাদের জানার অন্তর্গত এবং আমরা হলাম 'অহং'-এর জ্ঞাতা। দেশ, কাল, পাত্র, বস্তু, অবস্থা, পরিস্থিতি, ঘটনা প্রভৃতি সব কিছুর অবিদ্যমানতা আমাদের জানার মধ্যে আসে, কিন্তু নিজের (স্বয়ং-এর) অবিদ্যমানতা কখনও আমাদের জানার মধ্যে আসে না। যা জানার মধ্যে আসে তা আমাদের থেকে ভিন্ন এবং যে জানে সেটি হল আমাদের স্বরূপ। যা জানার মধ্যে আসে তা অ-সৎ, তার সত্তা বিদ্যমান নয় এবং যে জানে সে সৎ, তাঁর অ-ভাব বিদ্যমান নয়। সুতরাং জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতা—দুটি বিভাগ সম্পূর্ণ আলাদা। এই যথার্থ কথাটি যদি আমাদের জানার মধ্যে, অনুভূতির মধ্যে, লক্ষ্যে এসে যায় তাহলে তাতে কী অভ্যাস করতে হবে? আমরা দেখছি একটি নদী। আর যিনি নদীটিকে জানেন এমন কেউ বললেন যে এটি গঙ্গা—তাহলে এতে অভ্যাস কোথায়? এটি গঙ্গা নদী—এই জ্ঞান

একবারই হবে। বার বার হবে না এবং তা হবে চিরকালের জন্য, তার কারণ হলো প্রকৃত কথা কখনও অস্থায়ী হতে পারে না এবং অস্থায়ী কথা কখনও প্রকৃত হতে পারে না। প্রকৃত কথা মেনে নিতে পরিশ্রম কোথায়? অভ্যাস দৃঢ়-শিথিল হতে পারে কিন্তু প্রকৃত কথার স্বীকৃতি কখনও শিথিল হতে পারে না। তাৎপর্য হলো বোধ স্বতঃপ্রাপ্ত, কিন্তু আমাদের পুরাতন সংস্কার, পুরাতন মান্যতাই তত্ত্বজ্ঞানে অন্তরায়ের সৃষ্টি করছে। এই সংস্কারাদি হলো অ-সৎ, কিন্তু এগুলিকে আমরা সত্তা দিয়ে রেখেছি। যেমন, সব কাজ যখন ধীরে ধীরে সময় নিয়ে হয় তাহলে বোধ তৎক্ষণাৎ হবে কি করে? অনাদিকালের অজ্ঞানতা এত তাড়াতাড়ি কি করে দূর হবে? ইত্যাদি। এই সবই আমাদের ভ্রম। কোনো গুহায় যে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে অন্ধকার থাকে সেখানে প্রদীপ জ্বেলে দিলে সেই অন্ধকার দূর হতে কি লক্ষ লক্ষ বছর লাগবে?

সাধকের এখনই এই কথাটি ভালভাবে বুঝে নেওয়া দরকার যে অ-সতের বিভাগ আলাদা। অ-সতের সঙ্গে স্বয়ং-এর সম্বন্ধ কখনও হয়নি, কখনও হবে না, তা নেই এবং তা হতে পারে না। অ-সতের সঙ্গে তাদাত্ম্য (আমি-আমার ভাব)-এর কারণেই স্বয়ং-এর অ-সতের প্রতি আকর্ষণ দেখা যায়। বাস্তবিক দৃষ্টিতে দেখলে দেখা যাবে যে অ-সতের মধ্যেই অ-সতের প্রতি আকর্ষণ রয়েছে, অ-সতের মধ্যেই অ-সতের সত্তা ও গুরুত্ব রয়েছে, অ-সতের মধ্যেই সব দোষ, অ-সতের মধ্যেই সব বিকার, তারই মধ্যে কর্তা এবং ভোক্তা, তারই মধ্যে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়, তারই মধ্যে ভূত-ভবিষ্যৎ- বর্তমান, তারই মধ্যে ক্রিয়া এবং পদার্থ। অ-সতের মধ্যেই জন্ম-মৃত্যু, তারই মধ্যে বন্ধন। স্বয়ং (সৎ) হলো এই সবকিছুর জ্ঞাতা এবং এগুলি থেকে ভিন্ন। এই জন্ম-মৃত্যু সব অতীত কালের বিষয়, তাদের সত্তা নেই। কিন্তু স্বয়ং চিরকাল বর্তমান। গীতাতে আছে—

সর্বথা বর্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে।।

(১৩/২৩)

অর্থাৎ যা সম্পূর্ণরূপে বর্তমান তার আর পুনরায় জন্ম হয় না। কারণ যা সব সময় বর্তমান থাকে তার মৃত্যু কি করে হবে? আর মৃত্যু না হলে আবার জন্ম হবে কি করে? বর্তমান তো সর্বদা নির্দোষই হয়ে থাকে।

প্রশ্ন—মানুষ যা কিছু দোষ করে তা তো বর্তমানেই করে। তাহলে বর্তমান নির্দোষ হলো কি করে?

উত্তর—বর্তমানের অর্থ স্বয়ং; কেননা স্বয়ং নিরন্তর বর্তমান (বিদ্যমান) থাকে—'**নাভাবো বিদ্যতে সতঃ**।' স্বয়ং-এর বর্তমান হওয়া কালের অধীন নয় অর্থাৎ এতে ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানের ভেদ নেই। অতএব স্বয়ং-এর স্বরূপ হলো কেবল সত্তা। এই সত্তা চিরকালীন এবং সম্পূর্ণরূপে নির্দোষ—'**নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম**' (গীতা ৫/১৯) এইজন্য কারও বর্তমান দোষী নয়।

যদি কালের দৃষ্টিতেও বিচার করেন তাহলেও সকলের বর্তমান নির্দোষ। কেননা মানুষ অতীতে কৃত দোষের জন্যই নিজেকে দোষী মনে করে। যখন দোষ করে তখন মানুষ নিজেকে দোষী মনে করে না; কেননা সেই সময় সে হতচেতন, অসাবধানী থাকে। বর্তমানে তার অবস্থান নির্দোষ।

দোষের কোনো স্বতন্ত্র সত্তা নেই। গুণের নূন্যতাকেই দোষ বলা হয়। দোষশূন্যতা স্বতঃসিদ্ধ, ন্যূনতা আমাদেরই সৃষ্টি। অ-সৎকে সত্তা এবং গুরুত্ব দিলেই নিজেদের মধ্যে নূন্যতা প্রতীত হয়। অতএব সব দোষের প্রতীতি অ-সৎকে সত্তা এবং মহত্ত দিলেই হয়। যদি অ-সৎকে সত্তা এবং গুরুত্ব না দেন তাহলে দোষের প্রতীতি হবে কোথা থেকে?

দোষের ভাব (সত্তা) বিদ্যমান নেই এবং দোষশূন্যতার অ-ভাব বিদ্যমান নেই। দোষের আদি এবং অন্ত হয়, কিন্তু দোষশূন্যতার আদি এবং অন্ত হয় না। তাই দোষগুলির আদি-অন্ত, আসা-যাওয়া তথা তাদের অবিদ্যমানতার অনুভূতি সকলের হয়ে থাকে, কিন্তু নিজের (স্বয়ং-এর) আদি-অন্ত, আসা-যাওয়া এবং অবিদ্যমানতার অনুভূতি কখনও কারও হয় না। কেননা স্বয়ং নিরন্তর নির্দোষ, নির্বিকার থাকে। তাৎপর্য হলো দোষগুলির সহজনিবৃত্তি এবং দোষশূন্যতা স্বতঃপ্রাপ্ত।

❀ ❀ ❀

(৬) বিভাগযোগ

গীতায় আছে—

প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।

(১৩/১৯)

'প্রকৃতি এবং পুরুষ—দুটিকে তুমি অনাদি বলে জানো'।

তাৎপর্য হলো, একটি প্রকৃতি-বিভাগ, আর একটি পুরুষ-বিভাগ। শরীর এবং সংসার প্রকৃতি-বিভাগের অন্তর্গত আর আত্মা এবং পরমাত্মা পুরুষ-বিভাগের অন্তর্গত। প্রকৃতি এবং পুরুষ যেমন অনাদি তেমনই এই দুটির পার্থক্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্থাৎ বিবেকও অনাদি। অতএব যদি বিবেক দৃষ্টিতে দেখেন তাহলে এই দুটি বিভাগ পরস্পরের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে অসম্বন্ধ। অর্থাৎ দুটির মধ্যে বিন্দুমাত্র কোনো সম্বন্ধ নেই। প্রকৃতি তো অ-সৎ, জড় এবং দুঃখরূপ আর পুরুষ সৎ, চিৎ এবং আনন্দরূপ। প্রকৃতি বিনাশশীল, বিকারী এবং ক্রিয়াশীল আর পুরুষ অবিনাশী, নির্বিকার এবং অক্রিয়। প্রকৃতির আছে নিত্যনিবৃত্তি আর পুরুষের আছে নিত্যপ্রাপ্তি। গীতার আরম্ভেও ভগবান এই বিভাগেরই বর্ণনায় শরীর এবং শরীরী, দেহ এবং দেহী প্রভৃতি নাম দিয়েছেন।* অতএব এই বিভাগকে ভালভাবে বোঝা প্রত্যেক সাধকের পক্ষে খুবই প্রয়োজন এবং শীঘ্র বোধদায়ক। তার কারণ হলো শরীর এবং শরীরীকে এক মনে করাই বন্ধন আর এই দুটিকে সম্পূর্ণ পৃথক উপলব্ধি করাই মুক্তি। ভগবান বলেছেন—

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষং চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্।।

(গীতা ১৩/৩৪)

---

*অহংকে স্বীকার করলে পুরুষকেই জীব, ক্ষেত্রজ্ঞ, শরীরী, দেহী প্রভৃতি নাম দেওয়া হয়।

'যে জ্ঞানচক্ষু (বিবেকদৃষ্টি) দ্বারা ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের বিভাগকে এবং কার্য-কারণসহ প্রকৃতি থেকে স্বয়ংকে পৃথক জানে সে পরমাত্মতত্ত্বকে প্রাপ্ত হয়।'

যত ক্রিয়াই হোক তা সব কিছুই প্রকৃতি-বিভাগে হয়ে থাকে। এইজন্য গীতায় বলা হয়েছে যে সকল কাজ প্রকৃতির দ্বারাই হয়ে থাকে—

প্রকৃত্যৈব চ কর্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ।

(১৩/২৯)

প্রকৃতির দ্বারা যেসব ক্রিয়া হয়ে থাকে সেগুলিকে কোথাও গুণের দ্বারা কৃত ক্রিয়া আবার কোথাও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কৃত ক্রিয়া বলা হয়েছে। যথা—সকল কর্ম সর্বপ্রকারে প্রকৃতির গুণের দ্বারা সম্পন্ন হয়ে থাকে— **প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ** (৩/২৭) ; গুণই গুণের মধ্যে অবস্থান করে—**'গুণা গুণেষু বর্তন্তে'** (৩/২৮); গুণ ছাড়া অন্য কোনো কর্তাই নেই—**'নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি'** (১৪/১৯); ইন্দ্রিয়গুলি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের মধ্যেই অবস্থান করে— **'ইন্দ্রিয়ানীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্তে'** (৫/৯) প্রভৃতি। তাৎপর্য হলো এই যে ক্রিয়ার বিভাগ প্রকৃতিতেই আছে, পুরুষে নেই। অতএব প্রকৃতি কখনও এতটুকু অক্রিয় হয় না এবং পুরুষে কখনও বিন্দুমাত্র ক্রিয়া হয় না। তাই গীতায় বলা হয়েছে তত্ত্বের জ্ঞাতা সাংখ্যযোগী 'আমি (স্বয়ং) লেশমাত্র কর্ম করি না'—এমন উপলব্ধি করে থাকেন—**'নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ'** (৫/৮); স্বয়ং কিছু করে না, করায়ও না—**'নৈব কুর্বন্ন কারয়ন্'** (৫/১৩); এই পুরুষ শরীরে থেকেও কিছু করে না এবং লিপ্ত হয় না—**'শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে'** (১৩/৩১); যে স্বরূপকে অকর্তা দেখে (অনুভব করে) সেই যথার্থ দেখে— **'যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্তারং স পশ্যতি'** (১৩/২৯); যে আত্মাকে কর্তা বলে মানে, সেই দুর্মতি ঠিক বোঝে না, কেননা তার বুদ্ধি শুদ্ধ নয়— **'তত্রৈবং সতি কর্তারমাত্মানং কেবলং তু যঃ। পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্মতিঃ।।'** (১৮/১৬) প্রভৃতি।

কায়মনোবাক্যে যত ক্রিয়া হয়ে থাকে তা সবই প্রকৃতিতেই হয়। পুরুষ (স্বয়ং)-এ কখনও কিছুমাত্র কোনো ক্রিয়া হয় না। জঙ্গলে গাছ জন্মায়, বড় হয় এবং মরে যায়, প্রকৃতির যে সমষ্টি শক্তি সেখানে কাজ করে, সেই সমষ্টি শক্তি এই ব্যষ্টি শরীরেও কাজ করে। খাওয়া-দাওয়া, জাগা-ঘুমান প্রভৃতি সব আচরণ প্রকৃতিতে স্বতঃই হয়ে থাকে। যেমন খাদ্যকে হজম করতে হয় না, নিজেই হজম হয়। শিশু মায়ের কোলে নিজে থেকেই বড় হয়। শরীরের অবস্থা নিজে থেকেই বদলায়। বাড়ি নিজে থেকেই পুরাতন হয়ে যায়। বর্ষা আপনা থেকেই হয়। নদী নিজে থেকেই প্রবাহিত হয়। এইভাবে যে শরীরকে নিজের বলা হয় সেই শরীরের দ্বারা খাওয়া-দাওয়া প্রভৃতি ক্রিয়াগুলি নিজে থেকেই হয়ে থাকে। অতএব সাধকের ভাব সর্বদা এই হওয়া উচিত যে, ক্রিয়াগুলি হচ্ছে, আমি এতটুকু কিছু করছি না—**'নৈব কিঞ্চিৎ করোমি'**। তার কারণ ক্রিয়ার বিভাগ আলাদা।

সৃষ্টিতে স্বতঃই ক্রিয়া হচ্ছে। সেই ক্রিয়ার কোনো কর্তাই নেই। না পরমাত্মা কর্তা, না জীব কর্তা। যে ক্রিয়া স্বতঃই হয়ে থাকে তার জন্য কর্তৃত্বের প্রয়োজন কোথায়? প্রকৃতিতে স্বাভাবিক ক্রিয়াশীলতা আছে আর পুরুষে স্বাভাবিক অক্রিয়শীলতা আছে। কিন্তু যখন পুরুষ প্রকৃতির অংশ অহং-এর সঙ্গে তাদাত্ম্য মেনে নেয় তখন সে প্রকৃতিতে সংঘটিত ক্রিয়াকে নিজের মধ্যে স্বীকার করে 'আমি হলাম কর্তা' এমন মনে করে—**'অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে'** (গীতা ৩/২৭)। তাৎপর্য হলো, সে কর্তা হয় না, কেবল কর্তাগিরিকে মান্যতা দেয়। নিজেকে কর্তা মনে করলে তার উপর শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ প্রযোজ্য হয়ে যায় এবং তাকে কর্মফলের ভোক্তা হয়ে যেতে হয়। বস্তুত স্বরূপে কর্তৃত্ব লেশমাত্রও নেই। কর্তৃত্বের বিভাগই আলাদা। অদ্যাবধি দেব, মানুষ, পশু, পাখি, যক্ষ, রাক্ষস প্রভৃতি অনেক যোনিতে যতসব কর্ম করা হয়েছে, সেগুলির মধ্যে কোনোটিই স্বরূপ পর্যন্ত পৌঁছায়নি, কোনো শরীরও স্বরূপ অবধি পৌঁছায়নি, কেননা কর্ম এবং শরীর (পদার্থ)-এর বিভাগ আলাদা এবং স্বরূপের বিভাগও আলাদা।

যদি চার কোণা কোনো লোহার টুকরোকে আগুনে গরম করা হয় তাহলে লোহার সঙ্গে তাদাত্ম্য হওয়ার ফলে আগুনকেও চারকোণা

দেখায়। সেই রকম প্রকৃতির সঙ্গে তাদাত্ম্য (প্রকৃতিস্থ) হওয়ায় সম্পূর্ণরূপে নির্বিকার পুরুষেও প্রকৃতির বিকার দেখতে পাওয়া যায়। যেমন চুম্বকের দিকে লোহা আকৃষ্ট হয়, আগুন হয় না; কিন্তু লোহার সঙ্গে তাদাত্ম্য হয়ে যাওয়ায় আগুনকেও চুম্বকের মতো আকৃষ্ট হতে দেখা যায়। এইভাবে প্রকৃতির সঙ্গে তাদাত্ম্য হওয়ার ফলে সর্বদা অক্রিয় পুরুষেও প্রকৃতির বিকার পরিলক্ষিত হতে থাকে। তাৎপর্য হলো, বাস্তবে প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত না হলে পুরুষ কিঞ্চিৎমাত্র কর্তা ও ভোক্তা হতে পারে না। গীতায় বলা হয়েছে—

কার্যকরণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে।।
পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্ক্তে প্রকৃতিজান্‌গুণান্‌।
(গীতা ১৩/২০-২১)

'কার্য তথা করণের উৎপত্তিতে এবং পুরুষের কর্তৃত্বতে প্রকৃতিকে হেতু বলা হয়ে থাকে। আর সুখ-দুঃখের ভোক্তৃত্বে পুরুষকে হেতু বলা হয়। কিন্তু প্রকৃতিতে স্থিত পুরুষই প্রকৃতিজনিত গুণগুলির ভোক্তা হয়ে যায়।'

তাৎপর্য হলো প্রত্যেকটি ক্রিয়াই প্রকৃতিতে হয় কিন্তু ক্রিয়ার ফল অর্থাৎ সুখ-দুঃখের স্বীকৃতি পুরুষেই হয়ে থাকে। তার কারণ সুখ-দুঃখের ভোগ চেতনের মধ্যেই হতে পারে, জড়ে হতে পারে না। কিন্তু বাস্তবে প্রকৃতিস্থ পুরুষই সুখ-দুঃখের ভোক্তা হয়। প্রকৃতির মধ্যে স্থিতি পুরুষ মেনে নিয়েছে, বাস্তবে তা নেই। তাই পুরুষ যে কোনো লোকে বা যোনিতেই থাক বাস্তবে সে প্রকৃতিস্থ হয় না। সে তো সদা সর্বদা স্বস্থ ('স্ব'-তে স্থিত) থাকে—**'সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ'** (গীতা ১৪/২৪)। যখন সে শরীরস্থ নয় তখন সে প্রকৃতিস্থ কি করে হতে পারে? যেমন কোনো নারীর সঙ্গে পতি-পত্নির সম্পর্ক স্থাপিত হলে নারীর পরিবারের সকল আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে তার সম্পর্ক হয়ে যায়, তেমনই একটি শরীরে নিজের স্থিতি মেনে নিলে সমগ্র প্রকৃতির সঙ্গে তার সম্বন্ধ হয়ে যায়। তাৎপর্য হলো শরীরস্থ হলেই পুরুষ প্রকৃতিস্থ হয়ে যায়। সে যদি শরীরস্থ না হয় তাহলে প্রকৃতিস্থও হবে না। বাস্তবে স্বয়ং শরীরস্থও নয়,

প্রকৃতিস্থও নয়, তা হলো সর্বত্র স্থিত—**'সর্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে'** (গীতা ১৩/৩২)। সমস্ত ক্রিয়াই তার অন্তর্গত। সে সমস্ত ক্রিয়া এবং পদার্থের প্রকাশক ও আধার। ক্রিয়াগুলির তো আরম্ভ হয়ে শেষ হয়ে যায় আর পদার্থ উৎপন্ন হয়ে নাশ হয়ে যায়। কিন্তু তাদের প্রকাশক এবং আধার যেমনকার তেমন থাকে। ক্রিয়া এবং পদার্থ প্রকৃতিতে হয়। স্বয়ং-এ ক্রিয়াও নেই, পদার্থও নেই।

কিছু করার দায়িত্ব তারই হয় যে কিছু করতে পারে। যেমন, কোনো চিত্রকর যত বড় কুশলীই হোক, সামগ্রী (রং, তুলি প্রভৃতি) ছাড়া ছবি সে আঁকতে পারবে না। তেমনই পুরুষও প্রকৃতির সহায়তা ছাড়া কিছু করতে পারে না। তাই পুরুষের উপর কিছু করবার দায়িত্ব থাকতেই পারে না। চিন্ময়ী সত্তার কোনো ন্যূনতা থাকতে পারে না, তা সম্পূর্ণরূপে পরিপূর্ণ। তাই নিজের জন্য পুরুষের কোনো কিছুরই প্রয়োজন নেই। চিন্ময়ী সত্তা ছাড়া আর কিছুর অস্থিত্বই নেই। সুতরাং পুরুষের কোনো কিছুরই প্রয়োজন নেই। এইভাবে 'আমার (স্বয়ং-এর) কিছু করার নেই, কিছু প্রয়োজন নেই এবং আমার কিছু নেই'—এই তিনটি কথা ঠিক মতো বুঝতে পারলে প্রকৃতির সঙ্গে তাদাত্ম্য থাকবে না। প্রকৃতির সঙ্গে তাদাত্ম্য না থাকলে প্রকৃতিতে ক্রিয়া তো থাকবে, কিন্তু ভোগ করবার কেউ থাকবে না।

গীতায় আছে—

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারতঃ।।

(১৩/৩৩)

'হে ভারত! যেমন একটি সূর্য সমগ্র পৃথিবীকে আলোকিত করে, তেমনই ক্ষেত্রজ্ঞ (পুরুষ) সমস্ত ক্ষেত্রকে প্রকাশিত করে।'

তাৎপর্য হলো, সূর্য যেমন সমগ্র জগৎকে (দৃশ্যমান) আলোকিত করে এবং তার আলোকে সকল শুভাশুভ ক্রিয়া হয়ে থাকে, কিন্তু সূর্য সেই ক্রিয়াগুলির কর্তাও হয় না, ভোক্তাও হয় না, তেমনই স্বয়ং সমস্ত লোককে, সকল শরীরকে প্রকাশিত করে অর্থাৎ তাকে সত্তা-শক্তি দেয়, কিন্তু বাস্তবে স্বয়ং নিজে কিছু করে না এবং লিপ্তও হয় না। অর্থাৎ তাতে কর্তৃত্বও থাকে না, ভোক্তৃত্বও নেই। তাৎপর্য হলো স্বয়ং-এ প্রকাশত্বের

অভিমান নেই। এইকারণে সিদ্ধ মহাপুরুষদের জন্য স্পষ্টই বলা হয়েছে—

কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ।।

(গীতা ৪/২০)

'সে কর্মে ভালভাবে যুক্ত থেকেও বাস্তবে কোনো কিছুই করে না।'

স্বরূপে লেশমাত্রও কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব নেই—এটি স্বতঃ সিদ্ধ। এতে কোনো পুরুষার্থ নেই। অর্থাৎ এর জন্য কিছু করতে হয় না। কেবল এদিকে বিবেক দৃষ্টি রাখতে হয়। তাৎপর্য হলো, কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব দূর করতে হবে না। প্রত্যুত একে নিজের মধ্যে স্বীকার না করা প্রয়োজন, এর অবিদ্যমানতা অনুভব করতে হবে। কারণ বাস্তবে এ নিজের মধ্যে নেই। তাই সাধককে নিজের মধ্যে সর্বদা অ-কর্তৃত্ব এবং অ-ভোক্তৃত্ব অনুভব করতে হবে। নিজের মধ্যে নিরন্তর অ-কর্তৃত্ব এবং অ-ভোক্তৃত্ব অনুভব করাই হলো জীবন্মুক্তি।

স্বরূপ কেবল চিন্ময় সত্তা আর তাতে কিঞ্চিৎমাত্রও ক্রিয়া হয় না—

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে।।

(গীতা ১৩/৩১)

'হে কৌন্তেয়! এই পুরুষ স্বয়ং অনাদি এবং নির্গুণ হওয়ায় অবিনাশী পরমাত্মস্বরূপ। এ শরীরে অবস্থিত থেকেও কিছু করে না এবং কোনো কিছুতে লিপ্ত হয় না।'

যেমন বাইরে অনেক তরঙ্গ উত্থিত হচ্ছে দেখা গেলেও সমুদ্র গভীরতায় শান্ত থাকে। তেমনই বাইরে (আচরণে) সকল ক্রিয়া হতে থাকলেও সাধককে অন্তরে স্থির থাকতে হবে। তাৎপর্য হলো, বাইরে থেকে **'গুণা গুণেষু বর্তন্তে'** হতে থাকলেও অন্তরে **'ন করোতি ন লিপ্যতে'** থাকতে হবে অর্থাৎ চিন্ময় সত্তাতেই স্থির থাকতে হবে।

সাধকের এই ভুলটি প্রায়ই হয় যে তিনি খাওয়া-দাওয়া, জাগা-ঘুমান প্রভৃতি লৌকিক ক্রিয়াগুলিকে প্রকৃতিতে হয় বলে তা মেনে নেন— **'গুণা গুণেষু বর্তন্তে'**, কিন্তু জপ, ধ্যান, সমাধি প্রভৃতি পারমার্থিক ক্রিয়াগুলিকে নিজের দ্বারা কৃত এবং তা নিজের জন্য বলে মনে করেন। বাস্তবিকপক্ষে এ সাধকের কাছে বাধা! তার কারণ জ্ঞানযোগীর দৃষ্টিতে

ক্ষুদ্রতম কাজই হোক, আর বৃহত্তম কাজই হোক—সবই প্রকৃতির। লাঠি ঘোরান এবং মালা জপা দুটি ক্রিয়া ভিন্ন হলেও তা প্রকৃতিরই। তাই ভগবান বলেছেন—

শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায়ং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ।।

(গীতা ১৮/১৫)

'মানুষ কায়মনোবাক্যে শাস্ত্রবিহিত এবং শাস্ত্রনিষিদ্ধ যে কোনো কাজই আরম্ভ করুক না কেন তার এই (অধিষ্ঠান, কর্তা, করণ, চেষ্টা এবং দৈব) পাঁচটি হেতু হয়ে থাকে।'

তাৎপর্য হলো খাওয়া-দাওয়া, জাগা-ঘুমান প্রভৃতি থেকে জপ, ধ্যান, সমাধি পর্যন্ত লৌকিক-পারমার্থিক ক্রিয়াগুলি প্রকৃতিতেই হয়ে থাকে। অতএব সাধকের উচিত পারমার্থিক ক্রিয়াগুলিকে ত্যাগ না করা, কিন্তু তাতে নিজের কর্তৃত্ব যেন না মানেন; সেগুলি নিজের দ্বারা হচ্ছে এবং নিজের জন্য হচ্ছে—একথা যেন মনে না করেন। ক্রিয়া লৌকিক হোক আর পারমার্থিক হোক তার গুরুত্ব বাস্তবে জড়তারই গুরুত্ব। শাস্ত্রবিহিত হওয়ার জন্য পারমার্থিক ক্রিয়াগুলির অন্তরে যে বিশেষ গুরুত্ব থাকে তাও জড়তারই গুরুত্ব হওয়ার ফলে সাধকের পক্ষে বাধা*।

যেমন সকল ক্রিয়া প্রকৃতির, তেমনই সকল পদার্থও প্রকৃতিরই—

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্রিভির্গুণৈঃ।।

(গীতা ১৮/৪০)

'পৃথিবীতে অথবা স্বর্গে কিম্বা দেবতাদের মধ্যে এবং এগুলি ছাড়া অন্য কোথাও এমন বস্তু নেই যা প্রকৃতির দ্বারা সৃষ্ট এই তিনটি গুণরহিত।'

---

*ভগবানের জন্য যে উপাসনা করা হয় তাতে ভগবানের কৃপাই প্রধান থাকে; অতএব তাতে সাধকের কর্তৃত্ব থাকে না। ক্রিয়া, কর্ম, উপাসনা এবং বিবেক—এই চারটি আলাদা। 'ক্রিয়া' কারও সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত করে না। 'কর্ম' অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতি (ফল)-এর সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত করে। 'উপাসনা' ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত করে। 'বিবেক' জড় ও চেতনের সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ ঘটায়।

অতএব ক্রিয়া এবং পদার্থ দুটিই প্রকৃতি বিভাগে অবস্থিত। পুরুষ-বিভাগে সামান্যতম ক্রিয়া এবং পদার্থ নেই। ক্রিয়ার আরম্ভ এবং শেষ হয় আর পদার্থের উৎপত্তি ও বিনাশ তথা সংযোগ ও বিয়োগ হয়। কিন্তু পুরুষ আরম্ভ-শেষ, উৎপত্তি-বিনাশ, সংযোগ-বিয়োগ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।।

(গীতা ২/২০)

'এই শরীরী কখনও জন্মায় না, এর কখনও মৃত্যু হয় না, এটি সৃষ্ট হবার পর আবার নতুন করে অস্তিত্ব লাভ করে না, এটি জন্মরহিত, সদা-সর্বদা অবস্থান করে, শাশ্বত এবং পুরাতন (অনাদি)। শরীরের মৃত্যু হলেও এর মৃত্যু হয় না।'

করা, হওয়া এবং আছে—এই হলো তিনটি বিভাগ। 'করা' হওয়াতে এবং 'হওয়া' 'আছে'-তে যদি পরিবর্তিত হয়ে যায় তাহলে অহঙ্কারের সম্পূর্ণ বিনাশ হয়ে যায়। যার অন্তঃকরণে ক্রিয়া এবং পদার্থের গুরুত্ব থাকে, এমন অ-সাধক (সংসারী মানুষ) মনে করে যে 'আমি ক্রিয়া করছি'—**'অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে'** (গীতা ৩/২৭)। যে কর্তা হয় তাকে ভোক্তা হতেই হয়। যে সাধকের মধ্যে বিবেকের প্রাধান্য থাকে তিনি মনে করেন যে 'ক্রিয়া হচ্ছে'—**'গুণা গুণেষু বর্তন্তে'** (গীতা ৩/২৮)। অর্থাৎ 'আমি কিছুই করি না'—**'নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি'** (গীতা ৫/৮)। কিন্তু যাঁর তত্ত্বজ্ঞান হয়ে গিয়েছে এমন সিদ্ধ মহাপুরুষ কেবল সত্তা ও জ্ঞাতবৎ (অস্তি)-কেই উপলব্ধি করেন—**'যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে'** (গীতা ১৪/২৩)। সেই চিন্ময় সত্তা সকল ক্রিয়ায় যেমনকার তেমন থাকে। মহাপুরুষদের দৃষ্টি ক্রিয়ার উপর না থেকে স্বতঃই একমাত্র চিন্ময় সত্তা (অস্তি)-র দিকে থাকে।

যতক্ষণ পর্যন্ত 'করা' থাকে ততক্ষণ অহঙ্কারের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে। কেননা অহঙ্কার (কর্তৃত্ব) ছাড়া 'করা' সিদ্ধ হয় না। করার ভাব এলে

কর্তৃত্বাভিমান হয়েই যায়, কর্তৃত্বাভিমান হলে 'করা' হয়ে থাকে এবং করলে কর্তৃত্বাভিমান পুষ্ট হয়। এইজন্য কৃত সাধনার দ্বারা সাধক কখনও অহঙ্কাররহিত হতেই পারেন না। অহঙ্কারপূর্বক কৃত কর্ম কখনও কল্যাণকর হতে পারে না; কেননা অহঙ্কার হলো সকল অনর্থের, জন্ম-মৃত্যুর মূল। নিজের জন্য কিছু না করলে অহঙ্কারের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে না অর্থাৎ সমগ্র প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। তাই সাধকের উচিত ক্রিয়াকে গুরুত্ব না দিয়ে নিজের বিবেককে গুরুত্ব দেওয়া। বিবেককে গুরুত্ব দিলে বিবেক স্বতঃই স্পষ্ট হতে থাকে এবং সাধককে মার্গদর্শন করাতে থাকে। পরে সেই বিবেকই তত্ত্বজ্ঞানে পরিণত হয়ে যায়। তত্ত্বজ্ঞান হয়ে গেলে চিন্ময় সত্তাই অবশিষ্ট থাকে। সেই সত্তা সম্পূর্ণরূপে অসঙ্গ—**'অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ'** (বৃহদারণ্যক ৪/৩/১৫)। সেই সত্তায় স্বতঃসিদ্ধ অবস্থানই হলো মুক্তি আর তাছাড়া অন্য কিছু (প্রকৃতি এবং তার কাজ)-এর সঙ্গ হলো বন্ধন—**'কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্যোনিজন্মসু'** (গীতা ১৩/২১)।

প্রশ্ন—যে ক্রিয়া আমরা সঙ্কল্পপূর্বক করে থাকি তাতে স্পষ্টই এমন দেখা যায় যে 'আমি করছি।' যেমন ক্ষুধা পেলে যখন আমরা খাওয়ার সঙ্কল্প করি তো তখন স্পষ্ট দেখা যায় যে 'আমি খাচ্ছি'। তাহলে সকল ক্রিয়া প্রকৃতিতে হয়, আমি স্বয়ং কিছুই করি না—এটি কি করে মানব?

উত্তর—বাস্তবে সঙ্কল্পও প্রকৃতি (মন)-এতে হয়। কিন্তু বিবেক স্পষ্ট না হওয়ার কারণে অর্থাৎ মনের সঙ্গে তাদাত্ম্য মেনে নেওয়ার কারণে সঙ্কল্প নিজের বলে মনে হয়। ক্ষুধা পাওয়া স্বয়ং-এর ধর্ম নয়। প্রত্যুত তা হলো প্রাণের ধর্ম।* খাওয়া প্রাণকে পোষণ করার জন্য হয়। নিজেকে পোষণ করার জন্য হয় না। কিন্তু প্রাণের সঙ্গে তাদাত্ম্য হওয়ার ফলে এমনই মনে হয় যে 'আমার ক্ষিধে পেয়েছে' আর তখন এই সঙ্কল্প হয় যে আমি যেন খাই। যদি প্রাণের সঙ্গে একতা না মানেন তাহলে ক্ষুধা পেলেও খাওয়ার সঙ্কল্প হবে না, প্রত্যুত স্ফুরণ হবে। স্ফুরণ এবং সঙ্কল্পের প্রভেদ জানা খুবই আবশ্যক। স্ফুরণ সৃষ্টি হওয়ার পর দূর হয়ে

*ক্ষুধা পিপাসা প্রাণস্য মনসঃ শোকমোহকৌ।
জন্মমৃত্যু শরীরস্য ষড়ূর্মিরহিতঃ স্বয়ং।।

যায়। কিন্তু সঙ্কল্প স্থির হওয়ার পর দূর হয় না। বরং তা থেকে আরও কামনা সৃষ্টি হয়—**সঙ্কল্প প্রভবান্ কামান্** (গীতা ৬/২৪)। স্ফুরণ হলো দর্পনের মতো। দর্পনে দৃশ্য খুব স্পষ্ট দেখা যায়। কিন্তু দর্পন সেই দৃশ্য ধরে রাখে না। কিন্তু সঙ্কল্প ক্যামেরার ফিল্মের মতো। ক্যামেরার ফিল্মে দৃশ্য ধরা থাকে। অতএব স্ফুরণায় নির্লিপ্ততা থাকে এবং সঙ্কল্পে লিপ্ততা থাকে।

সিদ্ধ মহাপুরুষদের মধ্যে স্ফুরণ হয় এবং সাধারণ মানুষ এবং সাধকদের মধ্যে সঙ্কল্প হয়। জড়ের সঙ্গে তাদাত্ম্য হওয়ার কারণে জড়তার ন্যূণ্যতাকে সাধকেরা নিজেদের অল্পতা বলে মনে করেন। কিন্তু জড়তার সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হওয়ায় সিদ্ধপুরুষ নিজেদের মধ্যে জড়তার অল্পতা কখনও নিজেদের মধ্যে অনুভব করেন না। কেননা তাঁদের স্থিতি স্বতঃসিদ্ধ চিন্ময়তাতেই থাকে। সিদ্ধদের এটি স্বাভাবিক অনুভূতি যে সমস্ত ক্রিয়া কেবল প্রকৃতিতেই হয়। কিছু মাত্র স্বয়ং-এ হয় না। যা সিদ্ধদের উপলব্ধি, সাধকেরা তাকেই শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুকরণ করেন।

প্রশ্ন—অনুকরণ করার তাৎপর্য কী?

উত্তর—নিজের সঙ্গে কোনো ক্রিয়ারই সম্বন্ধ কোনো কালে ছিল না, এখন নেই, পরে হবে না এবং হওয়া সম্ভবও নয়—এই কথাকে দৃঢ়তার সঙ্গে মেনে নেওয়াই হলো সিদ্ধ পুরুষের উপলব্ধিকে অনুকরণ করা।

প্রশ্ন—দৃঢ়তার সঙ্গে মানতে গেলে যে বুদ্ধি প্রয়োগ করতে হবে অর্থাৎ বুদ্ধির যে সম্বন্ধ হবে তাতে তো এটি করণ-সাপেক্ষ হয়ে যাবে?

উত্তর—হ্যাঁ, প্রথমে বুদ্ধি প্রয়োগ করতে হবে, বলার এবং শোনার জন্য বাণী ও কানকেও যুক্ত করতে হবে, কিন্তু তত্ত্বকে জানাই (অনুভব করা) উদ্দেশ্য থাকার পরিণামে বুদ্ধি প্রভৃতি করণগুলির সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে।

প্রশ্ন—গীতাতে আছে যে, যে কোনো মানুষ (**কশ্চিৎ**), যে কোনো অবস্থায় (**জাতু**), ক্ষণমাত্র (**ক্ষণমপি**) কর্ম না করে থাকতে পারে না (৩/৫)। তাহলে কর্মের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ কি করে হবে?

উত্তর—সকল ক্রিয়াই কেবল প্রকৃতিতে হয়। কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে নিজের তাদাত্ম্য স্বীকার করলে মানুষ প্রকৃতি-জাত গুণের অধীন হয়ে

যায়— **'অবশঃ'** তথা তার ক্রিয়ার সঙ্গে সম্বন্ধ হয়ে যায়। সেইজন্য প্রকৃতির সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ মানে এমন যে কোনো মানুষই জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, মূর্ছা, সমাধি তথা সর্গ-মহাসর্গ, প্রলয়-মহাপ্রলয় প্রভৃতি কোনো অবস্থাতেই কোনো কিছু কাজ না করে থাকতে পারে না—

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।
কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ।।

(গীতা ৩/৫)

প্রশ্ন—সুষুপ্তি, মূর্ছা তথা সমাধি অবস্থায় ক্রিয়া কি করে হয়?

উত্তর—মানুষ যখন ঘুমায় তখন কেউ মাঝখানে ডাকলে সে বলে যে তার কাঁচা ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে সুষুপ্তির সময়েও ঘুম পাকবার ক্রিয়া চলছিল। এইভাবে মূর্ছা এবং সমাধির সময়েও ক্রিয়া হয়। পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রে এই ক্রিয়াকে 'পরিণাম' অভিধা দেওয়া হয়েছে।*

'পরিণাম'-এর অর্থ হলো—পরিবর্তনের ধারা অর্থাৎ বদলাবার প্রবাহ।+

তাৎপর্য হলো সমাধির প্রারম্ভ থেকে ব্যুত্থান হওয়া পর্যন্ত ক্রিয়া হতে থাকে। ক্রিয়া না হলে ব্যুত্থান হতেই পারে না। সমাধির সময় পরিণাম হয় আর সমাধির শেষে ব্যুত্থান হয়। প্রকৃতির সকল অবস্থার অতীত হলো সহজাবস্থা। সহজাবস্থা হয় স্বরূপের—যেখানে কোনো ক্রিয়া বিন্দুমাত্র হয় না। অতএব সহজাবস্থায় পরিণাম এবং ব্যুত্থান কখনই হয় না।

প্রশ্ন—সহজাবস্থা প্রাপ্তির উপায় কী?

---

*ব্যুত্থাননিরোধসংস্কারযোরভিভবপ্রাদুর্ভাবৌ নিরোধক্ষণচিত্তান্বয়ো নিরোধপরিণামঃ।।৯।।
সর্বার্থতৈকাগ্রতয়োঃ ক্ষয়োদয়ৌ চিত্তস্য সমাধিপরিণামঃ।। ১১ ।।
ততঃ পুনঃ শান্তোদিতৌ তুল্যপ্রত্যয়ৌ চিত্তস্যৈকাগ্রতাপরিণামঃ ।। ১২ ।। (বিভূতিপাদ)

+'অথ কোঽয়ং পরিণামঃ? অবস্থিতস্য দ্রব্যস্য পূর্বধর্মনিবৃত্তৌ ধর্মান্তরোৎপত্তিঃ পরিণামঃ (যোগদর্শন, বিভূতিপাদ ১৩-এর ব্যাসভাস্য)
'এই পরিণাম কী? অবস্থিত দ্রব্যের পূর্ব ধর্মের নিবৃত্তি হয়ে অন্য ধর্মের উৎপত্তি (অবস্থার)-ই হলো পরিণাম।'

উত্তর—উপায় হলো নিজের জন্য কিছু না করা অর্থাৎ খাওয়া-দাওয়া প্রভৃতি সাধারণ ক্রিয়াসহ জপ, ধ্যান, সমাধি পর্যন্ত সমস্ত ক্রিয়া অন্যের জন্য করা। তার কারণ, ক্রিয়াগুলি অন্য (প্রকৃতির) বিভাগের, স্বরূপ-বিভাগের নয়। মন, বুদ্ধি, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় এবং শরীরও 'অন্য' অর্থাৎ প্রকৃতিরই। নিঃস্বার্থভাবে অপরের কল্যাণের জন্য সকল কাজ করা হলো 'কর্মযোগ'। আমি কিছুই করি না। গুণই গুণের মধ্যে অবস্থান করে—এই রকম দেখা হলো 'জ্ঞানযোগ'। কেবল ভগবানের প্রসন্নতার জন্য সকল কাজ করা হলো 'ভক্তিযোগ'। নিজের জন্য সব কাজ করা হলো 'জন্মমরণযোগ'।

কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ—এই তিনটি সাধনাতেই নিজের জন্য কিছুই না করলে ক্রিয়া এবং পদার্থের সঙ্গে অর্থাৎ প্রকৃতি বিভাগের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ হয়ে যায়। আর এক চিন্ময় সত্তাতেই নিজের স্বতঃসিদ্ধ স্থিতির উপলব্ধি হয়। এটিই হলো সহজাবস্থা। এই সহজাবস্থা স্বতঃসিদ্ধ, এটিকে করা হয় না। যাকে করা হয় তা সহজাবস্থা নয়। প্রত্যুত তা হলো কৃত্রিম অবস্থা। এই সহজাবস্থা উপলব্ধ হলে আর কিছু করার, জানার, পাওয়ার বাকি থাকে না।

❁ ❁ ❁

(৭) শব্দের দ্বারা শব্দাতীতের লক্ষ্য

সংসারের সৃষ্টি এবং প্রতীতি হয়। পরমাত্মতত্ত্ব সৃষ্টির আশ্রয় এবং প্রতীতির প্রকাশক। তা সত্তারূপে সৃষ্টিকে আশ্রয় দেয় এবং চেতনরূপে প্রতীতিকে প্রকাশ করে অর্থাৎ সত্তা স্ফূর্তি দেয়। সৃষ্টি নিরন্তর বিনাশে এবং প্রতীতি নিরন্তর অবিদ্যমানতায় চলে যাচ্ছে। কিন্তু ঐগুলির আশ্রয় এবং প্রকাশক সদা-সর্বদা অপরিবর্তিত থাকে। সৃষ্টি এবং প্রতীতির প্রতি অনুরাগ বশতই তাদের আশ্রয় এবং প্রকাশক উপলব্ধ হয় না। তার কারণ অনুরাগ জন্মালে সৃষ্টি এবং প্রতীতিকে দৃষ্টি অতিক্রম করতে পারে না।

যা সৃষ্ট হয় তা নিজের আশ্রয়কে এবং যা প্রতীত হয় তা নিজের প্রকাশককে জানতে পারে না। তার কারণ সৃষ্ট বস্তু নিজের সৃষ্টিকারীকে মানতে পারে, কিন্তু জানতে পারে না। অতএব সৃষ্টির আশ্রয় এবং প্রতীতির প্রকাশককে সৃষ্টি তথা প্রতীতি (মন-বুদ্ধি)-থেকে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ ঘটিয়ে স্বয়ং-এর দ্বারাই জানা যায়। কেননা স্বয়ং-এর সৃষ্টি এবং প্রতীতি হয় না। এইজন্য গীতায় বলা হয়েছে—

'আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ' (২/৫৫),

'নিজেই নিজের দ্বারা এবং নিজের মধ্যে সন্তুষ্ট থাকে।'

'উদ্ধরেদাত্মনাত্মানম্' (৬/৫)

'নিজের দ্বারাই নিজেকে উদ্ধার করুন।'

'যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি' (৬/২০)

'যেখানে আত্মার দ্বারা আত্মাতেই আত্মাকে দেখে সন্তোষ লাভ হয়।'

তাৎপর্য হলো যে ঐ তত্ত্ব স্ব-বোধ্য, পর-বোধ্য নয়। মনের দ্বারা যা চিন্তা করা হয় তা মনের বিষয় (অনাত্মা)-এর বিষয়েরই চিন্তা হয়ে থাকে, পরমাত্মার বিষয় হয় না। বুদ্ধির দ্বারা যা নিশ্চয় করা হয় তা অবশ্যই বুদ্ধির বিষয়, কিন্তু পরমাত্মার বিষয় নয়। বাণীর দ্বারা যার বর্ণনা হয় তা বাণীর বিষয়েরই বর্ণনা হয়, পরমাত্মার বিষয় হয় না। তাৎপর্য

হলো, মন-বুদ্ধি-বাক্যের দ্বারা প্রকৃতির কাজেরই চিন্তন, নিশ্চয় তথা বর্ণনা করা হয়। কিন্তু পরমাত্মার প্রাপ্তি মন-বুদ্ধি-বাণী থেকে বিমুখ (সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ) হলেই হতে পারে। উপনিষদে আছে—

যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।।

(কেনোপনিষদ্ ১/৪)

বাক্য দ্বারা যার বর্ণনা করা যায় না, বরং যার শক্তিতে বাক্য নির্গত হয়, তাকেই তুমি ব্রহ্ম বলে জানবে। বাণীর দ্বারা বর্ণিত যে তত্ত্বকে লোকেরা উপাসনা করে তা ব্রহ্ম নয়।

যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।।

(কেনোপনিষদ্ ১/৫)

'যা মনের (অন্তঃকরণের) দ্বারা জানা যায় না, বরং যার দ্বারা মনকে জানা যায় তাকেই তুমি ব্রহ্ম বলে জান। মন-বুদ্ধির দ্বারা যাকে জানা যায় এমন যে তত্ত্বকে লোকেরা উপাসনা করে তা ব্রহ্ম নয়।'

প্রকৃতির কার্য যে মন-বুদ্ধি-বাণী তার দ্বারা যখন প্রকৃতিরই বর্ণনা হতে পারে না তখন প্রকৃতির অতীত তত্ত্বের বর্ণনা কি করে হতে পারে? আমরা প্রকৃতির রাজ্য (শরীর-সংসার)-এর মধ্যে অবস্থান করছি। অতএব প্রকৃতির অংশ (মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়)-এর দ্বারাই আমরা সৎ-তত্ত্ব (পরমাত্মা)-এর বর্ণনা করি; কিন্তু বাস্তবে সেই বর্ণনা অ-সতেরই হয়ে থাকে। সতের বর্ণনা কখনও হয়নি, হবে না, হওয়া সম্ভব নয়। তাই উপনিষদে বলা হয়েছে—

বাচা বদতি যৎকিঞ্চিৎসংকল্পৈ কল্প্যতে চ যৎ।
মনসা চিন্ত্যতে যদ্যৎসর্বং মিথ্যা ন সংশয়ঃ ।।

(তেজোবিন্দু ৫/৪৫)

'বাণীর দ্বারা যা কিছু বলা যায়, সঙ্কল্পের দ্বারা যা কিছু কল্পনা করা যায় এবং মনের দ্বারা যা কিছু চিন্তা করা যায় তা সবই মিথ্যা, এতে কোনো সংশয় নেই।'

শাস্ত্রে, সন্তবাণীতে পরমাত্মার যা বর্ণনা করা হয়েছে তা পরমাত্মতত্ত্বের দিকে লক্ষ্য করাবার জন্যই করা হয়েছে। তার কারণ

পরমাত্মার বর্ণনা করা যায় না। প্রত্যুত শাখাচন্দ্রন্যায়ের দ্বারা পরমাত্মার প্রতি নির্দেশ করা যায়। তাই শাস্ত্র এবং সাধুরা শব্দের দ্বারা শব্দাতীতের দিকেই লক্ষ্য করান, বর্ণনার দ্বারা বর্ণনাতীতের দিকে লক্ষ্য করান। যেমন নির্দিষ্ট লক্ষ্য পর্যন্ত বন্দুক যায় না, বন্দুকের গুলি যায়—তেমনই পরমাত্মতত্ত্ব পর্যন্ত শব্দ (বর্ণনা) পৌঁছায় না, প্রত্যুত পরমাত্মতত্ত্ব উদ্দিষ্ট হওয়ায় সাধকের ভাব পরমাত্মা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। কিন্তু এই দৃষ্টান্তও ঠিক মনে হয় না। তার কারণ বাস্তবে সাধকের ভাব পরমাত্মা পর্যন্ত পৌঁছায় না, কেবল তার ভ্রম, অজ্ঞানতা দূর হয়। তাতে তাঁর নিত্যপ্রাপ্ত পরমাত্মতত্ত্বের অনুভূতি হয়। তাৎপর্য হলো শব্দ পরমাত্মতত্ত্বের প্রাপ্তি করায় না, তার অপ্রাপ্তির ভ্রম দূর করে দেয়।

শব্দে অচিন্ত্য শক্তি আছে। যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে তখন ইন্দ্রিয়গুলি মনে, মন বুদ্ধিতে এবং বুদ্ধি অবিদ্যা (অজ্ঞান)-তে লীন হয়ে যায়। কিন্তু যখন ঘুমন্ত মানুষকে তার নাম নিয়ে ডাকা হয় তখন সে জেগে ওঠে। অতএব শব্দে এত শক্তি আছে যে অবিদ্যায় লীন থাকা শ্রবণেন্দ্রিয় পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং মানুষকে জাগিয়ে দেয়।* অন্য ইন্দ্রিয়গুলিতে নিজের নিজের অপরোক্ষ বিষয়ের জ্ঞান দেবার শক্তি আছে, কিন্তু শ্রবণেন্দ্রিয়তে অপরোক্ষ বিষয়ে জ্ঞান দেবার সঙ্গে সঙ্গে পরোক্ষ জ্ঞান দেবারও শক্তি আছে। তাৎপর্য হলো এই যে, যে বিষয়টিকে আমরা চামড়া দিয়ে স্পর্শ করতে পারি না এবং নাক দিয়ে ঘ্রাণ নিতে পারি না, সেই বিষয়কেও আমরা কান দিয়ে শুনতে পারি। এইজন্য সব সাধনায় 'শ্রবণে'র প্রধানতা থাকে। কান দিয়ে শুনেই সেই অনুসারে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগের অনুষ্ঠান করে আমরা

---

*শব্দশক্তেরচিন্ত্যত্বাৎ শব্দাদেবাপরোক্ষধীঃ।
প্রসুপ্ত পুরুষো যদ্বৎ শব্দেনৈবাববুধ্যতে।। (সদাচারানুসংধানম্ ১৯)

'শব্দে অচিন্ত্য শক্তি থাকার জন্য যেমন নিদ্রামগ্ন মানুষ কেবল শব্দ শুনেই জেগে ওঠে, তেমনই পরমাত্মতত্ত্বরও কেবল শব্দের দ্বারাই প্রত্যক্ষ হয়ে যায়।'

নির্বলত্বাৎ অবিদ্যায়া আত্মত্বাৎ বোধরূপিণঃ।
শব্দশক্তেরচিন্ত্যত্বাৎ বিদ্মস্তং মোহহানতঃ ।।

'অবিদ্যা দুর্বল হওয়ায় এবং আত্মা বোধস্বরূপ হওয়ায় আর শব্দে অচিন্ত্য শক্তি হওয়ায় মোহ দূর হলে আমরা পরমাত্মতত্ত্ব জেনে নিই।'

পরমাত্মতত্ত্বকে উপলব্ধি করি। যদিও চোখ দিয়ে শাস্ত্র পাঠ করে পরোক্ষ বিষয়ে জ্ঞান হয়, তবু শব্দেরই লিখিত রূপ হওয়ায় তাও মূলে শব্দেরই শক্তি। যেমন শাস্ত্রজ্ঞান অভিজ্ঞ মানুষদের কাছ থেকে শুনে হয় তেমন জ্ঞান কেবল পাঠ করে হয় না।†

শব্দের একটি শক্তি আছে এবং আর একটি আছে অভিজ্ঞতার শক্তি। অভিজ্ঞতাবিহীন শব্দ তো কেবল বারুদে ভরা বন্দুকের মতো, যা কেবল আওয়াজ করেই শান্ত হয়ে যায়। কিন্তু অভিজ্ঞতায় পূর্ণ শব্দ গুলিভর্তি বন্দুকের মতো, যা আওয়াজ করার সঙ্গে সঙ্গে আঘাতও করে। এইজন্য অভিজ্ঞ সাধুর বাণী শ্রোতাদের উপর যতটা প্রভাব বিস্তার করে সেই রকম প্রভাব অনভিজ্ঞ মানুষের বাণীর দ্বারা হয় না। শাস্ত্রতেও বলা হয়েছে যে, যে বক্তার মধ্যে নিম্নলিখিত চারটি দোষ থাকে তার বাণীর প্রভাব অন্যের উপর পড়ে না এবং সেই বাণী প্রকৃত তত্ত্বের কথাও বলতে পারে না—

(১) **ভ্রম**—বস্তুটি যেমন সেইভাবে তাকে না দেখে অন্যভাবে দেখা—এ হলো 'ভ্রম'। যদি বক্তার অন্তঃকরণে সংসারের সত্তা এবং গুরুত্ব থাকে তাহলে তিনি তত্ত্বের যে কথা বললেন অন্যের উপর তার প্রভাব পড়বে না। কারণ তাঁর অন্তঃকরণে সংসারের সত্তা এবং গুরুত্ব অখণ্ডরূপে থাকে। তাই তাঁর কথা শেখা বুলি না হয়ে অভিজ্ঞতালব্ধ হওয়া উচিত। তাঁর যদি নিজের কথাতেই কোনো সন্দেহ থাকে তাহলে তাতে স্পষ্ট করে বলে দেওয়া উচিত যে, আমি এই বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ নই। না লুকিয়ে স্পষ্ট করে বললে তার প্রভাব অপরের উপর পড়ে।

(২) **প্রমাদ**—অসাবধানতাকে (বেপরোয়াভাবকে) 'প্রমাদ' বলা হয়। বক্তা যদি তাঁর জানা বিষয় তৎপরতার সঙ্গে বিবেচনা না করেন, মন দিয়ে ঠিকভাবে না বলেন, অপরকে বোঝাতে উপেক্ষা করেন তাহলে অপরের উপর তাঁর প্রভাব পড়ে না।

(৩) **লিপ্সা**—টাকা-পয়সা, মান-সম্মান, আদর-আপ্যায়ন, সুখ-আরাম প্রভৃতি কিছু পাওয়ার ইচ্ছাকে 'লিপ্সা' বলে। যদি বক্তার মধ্যে

†বচন আগলে সন্তকা, হরিয়া হস্তী দন্ত। তাখ ন টূটে ভরমকা, সৈঁধে হী বিনু সন্ত।।

লিপ্সা থাকে তাহলে তিনি স্পষ্ট কথা বলতে পারবেন না। প্রত্যুত তিনি সেই কথাই বলবেন যার দ্বারা স্বার্থ সিদ্ধি হয়। যদি তিনি দেখেন যে তাঁর স্বার্থের হানি হচ্ছে তাহলে তিনি সত্য কথা গোপন করবেন।

(৪) **করণাপাটব**—করণে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদিতে পটুতা, কুশলতা না থাকাকে 'করণাপাটব' বলা হয়। বক্তা যে মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি করণের দ্বারা নিজের ভাব প্রকট করেন তাতে যদি কুশলতা না থাকে, তিনি যদি শ্রোতাদের ভাষা না জানেন, শ্রোতাদের ভাব, যোগ্যতা প্রভৃতি না জানেন,শ্রোতাদের তাদের যোগ্যতানুসারে বোঝবার উপযুক্ত দৃষ্টান্ত, যুক্তি প্রভৃতি না জানেন, তাহলে তাঁর কথা অপরে বুঝতে পারে না। তাঁর কথার প্রভাবও পড়ে না।

বাণীর এই চারটি দোষমুক্ত বক্তা খুবই দুর্লভ। শাস্ত্রতে বলা হয়েছে—

শতেষু জায়তে শূরঃ সহস্রেষু চ পণ্ডিতঃ।
বক্তা শতসহস্রেষু দাতা জায়তে বা ন বা।।

(ব্যাসস্মৃতি ৪/৫৮-৫৯; (স্কন্দপুরাণ মা. কুমা. ২/৭০)

"শত শত মানুষের মধ্যে একজন শূরের জন্ম হয়। হাজার হাজার মানুষের মধ্যে একজন পণ্ডিতের জন্ম হয়। শত সহস্র মানুষের মধ্যে একজন বক্তার সৃষ্টি; আর দাতার জন্ম তো হতেও পারে, নাও হতে পারে।"

(৮) মুক্তিতে সকলের সমান অধিকার

মুক্তি অথবা তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তির প্রধান বাধা হলো অহঙ্কার। শরীর হলো জড় প্রকৃতির কার্য, তাকে নিজের স্বরূপ মনে করলে অহঙ্কার অর্থাৎ দেহাভিমান সৃষ্টি হয়। অহঙ্কার থেকে পরিচ্ছিন্নতা (একদেশদর্শিতা) সৃষ্টি হয় আর পরিচ্ছিন্নতা থেকে আবার বর্ণ, আশ্রম, সম্প্রদায় প্রভৃতিকে নিয়ে হাজার রকমের বিভেদের সৃষ্টি হয় ; যেমন আমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয়, আমি বৈশ্য, আমি শূদ্র, আমি ব্রহ্মচারী, আমি গৃহস্থ, আমি বানপ্রস্থী, আমি সন্ন্যাসী প্রভৃতি। তাৎপর্য হলো এই বিভেদ অহঙ্কার থেকে সৃষ্টি হয়। যতক্ষণ অহঙ্কার থাকে ততক্ষণ বিভেদ দূর হয় না। যেখানে ভেদাভেদ থাকে সেখানে জ্ঞান থাকে না। আর যেখানে জ্ঞান থাকে সেখানে ভেদাভেদ থাকে না। অতএব মুক্তি অথবা তত্ত্বজ্ঞান অহঙ্কার দূর হলেই লাভ হয়। এজন্য গীতায় যেখানে জ্ঞানপ্রাপ্তির সাধনার বর্ণনা আছে সেখানে (সাধনারও) অহঙ্কার থেকে মুক্ত থাকতে বলা হয়েছে—**'অনহঙ্কারঃ এব চ'** (১৩/৮) তার কারণ জ্ঞান প্রাপ্তিতে দেহাভিমান প্রধান বাধা—

অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে।। (গীতা ১২/৫)

'দেহাভিমানির দ্বারা অব্যক্ত-বিষয়ক গতি কঠিনতার দ্বারা প্রাপ্ত হয়।'

সংসৃত মূল সূলপ্রদ নানা। সকল সোক দায়ক অভিমানা।।

(মানস ৭/৭৪/৩)

তাহলে যে বলে 'আমি ব্রাহ্মণ', 'আমি সন্ন্যাসী', আর যে বলে 'আমি অন্ত্যজ', 'আমি গৃহস্থ'—এই উভয়ের দেহাভিমানে পার্থক্য কোথায়? দেহাভিমানের দৃষ্টিতে উভয়েই সমান। দেহের অধ্যাসই হলো ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী প্রভৃতি এবং দেহের অধ্যাসই হলো অন্ত্যজ, গৃহস্থ ইত্যাদি। বাস্তবে তত্ত্বজ্ঞানপ্রাপ্তি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থী, সন্ন্যাসী কারও হয় না, তা হয় যে জিজ্ঞাসু তার। তাৎপর্য হলো তীব্রভাবে যে জিজ্ঞাসু সে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি কিছুই হয় না—

নাহং মনুষ্যো ন চ দেবযক্ষৌ
ন ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রঃ।
ন ব্রহ্মচারী ন গৃহী বনস্থো
ভিক্ষুর্ন চাহং নিজবোধরূপঃ।।

(হস্তামলকস্ত্রোত্র)

সন্তো, অব হম আপা চীন্‌হা।
নিজ স্বরূপ প্রাপ্ত হ্যায় নিত হী, অচরজ সহিত স কীন্‌হা।।
না হম মানুষ-দেবতা নাহীঁ, না গিরহী বনখণ্ডী।
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্যহু নাহীঁ, না হম শূদ্র ন দণ্ডী।।
না হম জ্ঞানী চতুর ন মূরখ, না হম পণ্ডিত পোথী।
না হম সাগর ন মরজীবা, না হম সীন ন মোতী।।
না হম স্বর্গলোক কো জাতে, না হম নরক সিধারে।
হম সব রূপ সবন তে ন্যারা, না জীতা না হারে।।
ন হম অমর মরে না কবহূঁ, কবীর জ্যোঁ-কা-ত্যোঁ হী।
ব্যাস কপিল মুনি বামদেব ঋষি, সবকা অনুভব যোঁ হী।।

অতএব জিজ্ঞাসুর মধ্যে বর্ণ, আশ্রম, সম্প্রদায় প্রভৃতির জন্য অহঙ্কার কিংবা আগ্রহ থাকা উচিত নয় এবং অন্য বর্ণ, আশ্রম প্রভৃতির সম্পর্কে উচ্চ-নীচ ভাব থাকা উচিত নয়। বর্ণ, আশ্রম প্রভৃতির বিভেদ মনুষ্য-জীবনকে মর্যাদায় রাখার জন্য আর মর্যাদা হলো সংসার-সঞ্চালনের জন্য। কিন্তু মুক্তির জন্য বর্ণ, আশ্রম প্রভৃতি বিভেদের প্রয়োজন নেই। তার কারণ মুক্তি শরীরের হয় না, স্বয়ং এর হয় এবং তা মুক্ত স্বরূপ-ই। বর্ণ-আশ্রমের বিভেদ শরীরকে নিয়ে হয়। শরীর যখন নিজের স্বরূপই নয় তখন বর্ণ-আশ্রমের ভেদ নিজের স্বরূপ কেমন করে?

তস্মাদন্যগতা বর্ণা আশ্রমা অপি নারদ।
আত্মন্যারোপিতাঃ সর্বে ভ্রান্ত্যা তে নাত্মবেদিনা।।

(নারদপরিব্রাজক ৬/১৪)

'নারদ! সকল বর্ণ এবং আশ্রম অন্যগত (শরীরগত) হওয়া সত্ত্বেও ভ্রান্তিবশত সেগুলিকে আত্মাতে আরোপিত করে নেওয়া হয়, কিন্তু আত্মবেত্তা পুরুষ এমন করেন না।'

এজন্য মুক্তি হয়ে গেলে স্বয়ং-এর শরীরের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে যায়, সংসার থেকে শরীরের সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হয় না। অর্থাৎ স্বয়ং শরীর থেকে অসঙ্গ (পৃথক) হয়ে যায়, শরীর সংসার থেকে অসঙ্গ হয় না। তার কারণ প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তনশীল শরীরের সম্বন্ধ সংসারের সঙ্গে, স্বয়ং -এর সঙ্গে নয়।

বর্ণ-আশ্রমের স্বীকৃতি এক প্রতিরূপের জন্য। আমাদের স্বরূপ ব্রাহ্মণাদি নয়। যেমন, নাটকে যে লক্ষ্মণের ভূমিকায় অভিনয় করে সে তার অভিনয়ে বাইরে লক্ষ্মণের ঠিক নকল করতে থাকলেও অন্তরে সে নিজেকে লক্ষ্মণ মনে করে না। তার মনে সব সময় এই ভাব থাকে যে সে শুধু নকল করছে। বাস্তবে সে লক্ষ্মণ নয়। তেমনই বাইরে বাইরে নিজের বর্ণ-আশ্রমের শাস্ত্র এবং লোক-রীতি অনুসারে সব কিছু ঠিকভাবে পালন করেও এই মনোভাবই থাকা উচিত যে আমি তো ভগবানের অংশ।

যে, যে বর্ণাশ্রমের মানুষ সে যদি সেই বর্ণাশ্রমানুসারে বিহিত সকল কর্ম ভালভাবে পালন করে এবং নিষিদ্ধ কর্মগুলি ত্যাগ করে তাহলে তার অহঙ্কার সহজেই দূর হয়ে যাবে। সে যদি বিহিত কর্মের সঙ্গে নিষিদ্ধ কাজগুলিও করতে থাকে তাহলে অহং ভাব দূর হবে না। নিষিদ্ধ কর্ম-ত্যাগে মনে এমন জোর থাকা উচিত যাতে ভুলেও সেদিকে মন না যায়। যেমন, রাজা দুষ্মন্তের মন শকুন্তলার দিকে চলে গেলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে শকুন্তলা ব্রাহ্মণ কন্যা নয়, সে ক্ষত্রিয় কন্যা। কেননা সে যদি ব্রাহ্মণ কন্যা হোত তাহলে আমার মন তার দিকে ধাবিত হোত না।

অসংশয়ং ক্ষত্রপরিগ্রহক্ষমা যদার্যমস্যামভিলাষি মে মনঃ।
সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু প্রমাণমন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ।।

(অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ ১/২১)

'এতে সন্দেহ নেই যে সে ক্ষত্রিয়ের দ্বারা গ্রহণযোগ্য, তাই আমার বিশুদ্ধ মন তাকে চায় ; কেননা যেখানে সংশয় সেখানে সৎপুরুষদের অন্তঃকরণের প্রবৃত্তিই হলো ব্রাহ্মণ।'

রামের সম্পর্কেও এই একই কথা। তাঁর মন সীতার দিকে গেলে তিনি বুঝতে পারলেন যে সে পরনারী নয় ; কেননা আমার বিয়ে এঁর সঙ্গেই হবে—

রঘুবংসিন্হ কর সহজ সুভাউ। মনু কুপন্থ পগু ধরই ন কাউ।।
মোহি অতিশয় প্রতীতি মন কেরী। জেহিঁ সপনেহুঁ পরনারি ন হেরী।।
(রামচরিতমানস ১/২৩১/৩)

যারা নিজেদের কোনো বর্ণ এবং আশ্রমের বলে মনে করে তারা শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের অধিকারী হয়ে যায়। তারা যদি নিষিদ্ধকে ত্যাগ করে বিহিত (নিজেদের বর্তব্য) কর্ম পালন করে তাহলে তাদের অবশ্যই উন্নতি হবে। যদি তারা নিষ্কামভাবে নিজেদের কর্তব্য পালন করে এবং নিজেদের অহংভাবকে বদলে দেয় এইভাবে যে আমরা কোনো বর্ণ-আশ্রমের নই, কেবল যোগী, জিজ্ঞাসু এবং ভক্ত—তাহলে তারা মুক্তির অধিকারী হয়ে যাবে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণগুলির সৃষ্টি প্রকৃতিজনিত গুণগুলি অনুসারে হয়; যেমন, সত্ত্বগুণের প্রধানতায় ব্রাহ্মণের, রজোগুণের প্রধানতা ও সত্ত্বগুণের গৌণতায় ক্ষত্রিয়ের, রজোগুণের প্রধানতা ও তমোগুণের গৌণতায় বৈশ্যের এবং তমোগুণের প্রধানতায় শূদ্রের সৃষ্টি হয়েছে। যার মধ্যে ব্রাহ্মণত্বের অভিমান ও আগ্রহ আছে তার স্থিতি গুণের মধ্যে থাকলে গুণানুসারে তার উচ্চ-নীচ জাতি হয়, কিন্তু মুক্তি হবে না—**'কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্যোনিজন্মসু'** (গীতা ১৩/২১)। যার গুণের অভিমান আছে সে কি করে গুণাতীত হতে পারে? পারে না। গুণাতীত হলে বর্ণ-আশ্রমের প্রতি অভিমান এবং আগ্রহ থাকতে পারে না। অতএব নিজের বর্ণ-আশ্রমের অভিমান ছেড়ে দিয়ে বাইরে থেকে সেগুলির সীমা মেনে চলা এবং ভিতরে 'আমি তো ভগবানের, কোনো বর্ণ-আশ্রমের নই'—এই ভাব থাকা খুবই প্রয়োজন।

যখন সাধকের উদ্দেশ্য একমাত্র পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত করার হয়ে যায় তখন তিনি নিজেকে কেবল যোগী, কেবল জিজ্ঞাসু অথবা কেবল ভক্ত বলে মনে করেন। এই রকম মনে করলেই তিনি প্রকৃত সাধক হন এবং তাঁর দ্বারা নিরন্তর সাধনা হতে থাকে। তিনি যদি নিজেকে সাধক বলে মনে করেও 'আমি ব্রাহ্মণ, আমি শূদ্র, আমি গৃহস্থ, আমি সন্ন্যাসী, আমি স্ত্রীলোক, আমি পুরুষ, আমি বালক, আমি বৃদ্ধ, আমি রুগী, আমি নিরোগ' প্রভৃতি মনে করেন তাহলে তাঁর সাধনায় অদৃঢ়তা (শিথিলতায়) থাকবে—সেটি তাঁর কল্যাণ লাভে বাধক হবে। তাঁর উচিত নিজের

সাধনায় এত তল্লীন হওয়া যাতে সাধক থাকবে না, সাধনামাত্রই থাকবে, অর্থাৎ যোগী থাকবে না, যোগমাত্র থাকবে। জিজ্ঞাসু না থেকে কেবল জিজ্ঞাসা থাকবে, ভক্ত না থেকে কেবল ভক্তি থাকবে। কেবল সাধনা থাকলে সাধন-সাধ্য এক হয়ে যায় অর্থাৎ সাধ্য-তত্ত্ব প্রাপ্ত হয়ে যায়।

শাস্ত্রে এমন অনেক কথা আছে যাতে একথা সিদ্ধ হয় যে প্রত্যেক বর্ণ এবং আশ্রমের মানুষ তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত করতে পারে ; যেমন—

তস্মাৎ জ্ঞানং সর্বতো মার্গিতব্যং সর্বত্রস্থং চৈতদুক্তং ময়া তে।
তৎস্থো ব্রহ্মা তস্থিবাংশ্চাপরো যস্তস্মৈ নিত্যং মোক্ষমাহুর্নরেন্দ্র।।

(মহাভারত শান্তিপর্ব ৩১৮/৯২)

'নরেন্দ্র ! সব দিক থেকে জ্ঞান প্রাপ্ত করবার প্রযত্ন করা উচিত। আমি তো তোমাকে আগেই বলেছি যে সকল বর্ণের লোক নিজের নিজের আশ্রমে থেকেও জ্ঞান প্রাপ্ত করতে পারে। অতএব ব্রাহ্মণই হোক অথবা অন্য কোনো বর্ণেরই হোক, যে মানুষ জ্ঞান স্থিত, তাঁর পক্ষে মোক্ষ নিত্য প্রাপ্ত।'

স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ। (গীতা ১৮/৪৫)

'নিজ নিজ কর্মে তৎপরতাপূর্বক নিযুক্ত মানুষ সম্যক সিদ্ধি (পরমাত্মতত্ত্ব) প্রাপ্ত করেন।'

স্বকর্মণা তমভ্যর্চ সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ।। (গীতা ১৮/৪৬)

'নিজের কর্মের দ্বারা পূজা করে মানুষ সেই পরমাত্মাকে লাভ করে।'

তাৎপর্য হলো এই যে, ব্রাহ্মণ নিজের কর্তব্য সম্পাদন করে যে পদ লাভ করে শূদ্রও তার কর্তব্য পালন করে সেই পদ প্রাপ্ত করতে পারে। শুধু তাই নয়, জিজ্ঞাসা তীব্র হলে পাপিষ্ঠতম মানুষও তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে পারে—

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি।।

(গীতা ৪/৩৬)

'যদি তুমি নিকৃষ্টতম পাপী হও তাহলেও জ্ঞানরূপী নৌকার দ্বারা সমগ্র পাপসমুদ্র তুমি ভাল করে পার হয়ে যাবে।'

সকল মানুষই ভগবৎ ভক্তিলাভের অধিকারী—

আনিন্দ্যোন্যধিক্রিয়তে পারম্পর্যাৎ সামান্যবৎ।

(শাণ্ডিল্য ভক্তিসূত্র, ৭৮)

'যেমন দয়া, ক্ষমা প্রভৃতি সাধারণ ধর্মের সকল মানুষই অধিকারী, তেমনই নিম্নতম থেকে উচ্চতম যোনির সকল প্রাণীও ভগবৎ ভক্তির অধিকারী।'

নাস্তি তেষু জাতিবিদ্যারূপকুলধনক্রিয়াদি ভেদঃ।

(নারদ ভক্তিসূত্র, ৭২)

'সেই সব ভক্তের মধ্যে জাতি, বিদ্যা, রূপ, কুল, ধন, ক্রিয়া প্রভৃতি কোনো ভেদ নেই।'

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্।।
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।

(গীতা ৯/৩২-৩৩)

'হে পার্থ! পাপযোনিজাত, তথা মানুষ অথবা নারী, বৈশ্য এবং শূদ্রও আমার শরণ নিলে নিঃসন্দেহে পরমগতি প্রাপ্ত হয়। আর যারা পবিত্র আচরণকারী ব্রাহ্মণ এবং ঋষিরূপ ক্ষত্রিয় ভগবানের ভক্ত তারা পরমগতি লাভ করবে তাতে আর বলার কী আছে।'

কিরাতহূণান্ধ্রপুলিন্দপুল্কসা
আভীরকঙ্কা যবনাঃ খসাদয়ঃ।
যেঽন্যে চ পাপা যদুপাশ্রয়াশ্রয়াঃ
শুদ্ধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ।।

(শ্রীমদ্ভাগবত ২/৪/১৮)

'যাঁর আশ্রিত ভক্তের আশ্রয় নিয়ে কিরাত, হূণ, আন্ধ্র, পুলিত, পুৎকস, আভীর, কঙ্ক, যবন, খস প্রভৃতি অধম জাতির লোকেরা এবং তারা ছাড়া অন্য পাপিষ্ঠরাও শুদ্ধ হয়ে যায়, সেই জগৎ প্রভু ভগবান বিষ্ণুকে নমস্কার।'

জাতি পাঁতি কুল ধর্ম বড়াঈ। ধন বল পরিজন গুন চতুরাঈ।
ভগতি হীন নর সোহই কৈসা। বিনু জল বারিদ দেখিঅ জৈসা।।

(মানস ৩/৩৫/৩)

ব্যাধস্যাচরণং ধ্রুবস্য চ বয়ো বিদ্যা গজেন্দ্রস্য কা।
কা জাতির্বিদুরস্য যাদবপতেরুগ্রস্য কিং পৌরুষম্।।

কুব্জায়াঃ কিমু নাম রূপমধিকং কিং তৎসুদাম্নো ধনং।
ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলং ন চ গুণৈর্ভক্তিপ্রিয়ো মাধবঃ।।

ব্যাধের কোন্ আচরণ শ্রেষ্ঠ? ধ্রুবর বয়স এমন কী ছিল? গজেন্দ্রর কাছে কোন্ বিদ্যা ছিল? বিদুরের জাতি কতটা উঁচু ছিল? যদুপতি অগ্রসেনের কেমন পরাক্রম ছিল? কুব্জার রূপ কেমন সুন্দর ছিল? সুদামার কাছে অর্থ কত ছিল? তাহলেও তারা ভগবানকে পেয়েছিল। কারণ ভগবানের কাছে কেবল ভক্তিই প্রিয়। তিনি কেবল ভক্তিতেই সন্তুষ্ট। আচরণ, বিদ্যা প্রভৃতি গুণে নয়।'

নালং দ্বিজত্বং দেবত্বমৃষিত্বং বাসুরাত্মজাঃ।
প্রীণনায় মুকুন্দস্য ন বৃত্তং ন বহুজ্ঞতা।।
ন দানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানি চ।
প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্ বিড়ম্বনম্।।
দৈতেয়া যক্ষরক্ষাংসি স্ত্রিয়ঃ শূদ্রা ব্রজৌকসঃ।
খগা মৃগাঃ পাপজীবাঃ সন্তি হ্যচ্যুততাং গতাঃ।।

(শ্রীমদ্ভাগবত ৭/৭, ৫১-৫২, ৫৪)

'দৈত্যবালকগণ! ভগবানকে প্রসন্ন করার জন্য কেবল ব্রাহ্মণ, দেবতা বা ঋষি হওয়া; সদাচার ও বিবিধ জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া; দান, তপ, যজ্ঞ, শারীরিক ও মানসিক স্বচ্ছতা এবং বড় বড় ব্রত অনুষ্ঠান মোটেই পর্যাপ্ত নয়, ভগবান কেবল নিষ্কাম প্রেম-ভক্তিতেই প্রসন্ন হন। আর সব কিছু বিড়ম্বনা মাত্র। ভগবানের প্রতি ভক্তির প্রভাবে দৈত্য, যক্ষ, রাক্ষস, নারী, শূদ্র, গোপালক, অহীর, পক্ষী, মৃগ এবং অনেক রকম পাপী জীবও ভগবানকে প্রাপ্ত করেছেন।'

শুধু তাই নয়, পাপিষ্ঠ মানুষও ভক্তির অধিকারী হতে পারে—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ব্যবসিতো হি সঃ।।
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।।

(গীতা ৯/৩০-৩১)

'যদি কোনো প্রচণ্ড দুরাচারীও অনন্য ভাবের দ্বারা আমার ভজনা করে তাহলে তাকে সাধু বলে মনে করা উচিত। কারণ সে খুব ভালভাবে শ্রেষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সে তৎকাল ধর্মাত্মা হয়ে যায় এবং চিরশান্তি

লাভ করে। হে কুন্তীনন্দন! তুমি প্রতিজ্ঞাপূর্বক জেনে রাখ যে আমার ভক্তের বিনাশ (পতন) হয় না।'

তাৎপর্য হলো, ভগবানের অংশ হওয়ায় জীবমাত্রেরই ভগবৎ-মুখী হওয়ার, ভগবানকে পাওয়ার স্বতঃসিদ্ধভাবে অধিকার, স্বাতন্ত্র্য এবং সামর্থ্য আছে। প্রতিটি জীব স্বরূপতঃ নিত্য শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বরূপ—**'অয়মাত্মা ব্রহ্ম', 'তত্ত্বমসি'**। অতএব সকল জীব স্বরূপ-বোধের অধিকারী, স্বতন্ত্র এবং সমর্থ। বর্ণ, আশ্রম প্রভৃতিকে নিয়ে এরকম মনে করা যে অমুক বর্ণ অথবা আশ্রমের মানুষ তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তির অধিকারী আর অমুক বর্ণ ও আশ্রমের মানুষ তত্ত্বজ্ঞান লাভের অধিকারী নয়—এটি শাস্ত্র এবং যুক্তিসঙ্গত নয়। উত্থান ও পতন সকল বর্ণ-আশ্রমাদিতে হতে পারে। সকল বর্ণ-আশ্রমের মানুষ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে পারে। শুধু তাই নয় তারা তত্ত্বজ্ঞান দানের অধিকারীও হয়ে যেতে পারে—

প্রাপ্য জ্ঞানং ব্রাহ্মণাৎ ক্ষত্রিয়াদ্ বা
বৈশ্যাচ্ছূদ্রাদপি নীচাদভীক্ষ্ণম্।
শ্রদ্ধাতব্যং শ্রদ্দধানেন নিত্যং
ন শ্রদ্ধিনং জন্মমৃত্যু বিশেতাম্।।

(মহাভারত শান্তিপর্ব ৩১৮/৮৮)

'ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র অথবা নীচ বর্ণে জন্ম নেওয়া মানুষের কাছ থেকে যদি জ্ঞান পাওয়া যায় তবে তা লাভ করে মানুষকে তার প্রতি সদা শ্রদ্ধা রাখা উচিত। যার অন্তরে শ্রদ্ধা আছে সেই মানুষের মধ্যে জন্ম-মৃত্যুর প্রবেশ হতে পারে না।'

দৃষ্টান্তস্বরূপ, বেদব্যাসের পুত্র শুকদের জ্ঞান লাভের জন্য রাজর্ষি জনকের কাছে গিয়েছিলেন। ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করবার জন্য একসঙ্গে ছয়জন ঋষি মহারাজ অশ্বপতির কাছে গিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে শঙ্করাচার্যের কথা স্মরণ যোগ্য—

'যত এবং মহাশালা মহাশ্রোত্রিয়া ব্রাহ্মণাঃ সন্তো মহাশালত্বাদ্যভিমানং হিত্বা সমিদ্ভারহস্তা জাতিতো হীনং রাজানং বিদ্যার্থিনো বিনয়েনোপজগ্মুঃ

(ছান্দোগ্য ৫/১১/৭-এর ভাষ্য)

এই রকম মহাগৃহস্থ এবং পরম শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও তারা মহাগৃহস্তত্ব প্রভৃতি অহঙ্কার ত্যাগ করে, হাতে সমিধ্ নিয়ে এবং বিদ্যার্থী হয়ে নিজেদের জাতি অপেক্ষা হীন জাতির রাজার কাছে সবিনয়ে

উপস্থিত হয়েছিলেন। এজন্য ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করতে ইচ্ছুক অন্য মানুষদের তেমনই হওয়া উচিত।'

নীচ বর্ণে জন্মালেও বিদুর, কবীর, রৈদাস, সদন কসাই, ধর্মব্যাধ প্রভৃতি অনেক মহাপুরুষকে জীবন্মুক্ত, তত্ত্বজ্ঞ, ভগবৎপ্রেমী বলে মনে করা হয়। আর উচ্চ বর্ণে জন্মালেও রাবণ প্রভৃতি অনেকে পাপী হয়েছে। গার্গী, দেবদূতি, শবরী, কুন্তি, ব্রজের গোপীরা, ভক্তিমতি মীরা প্রভৃতিরা নারী ছিলেন। সমাধি, তুলাধার প্রভৃতিরা বৈশ্য ছিলেন। বিদুর, সঞ্জয়, নিষাদরাজ গুহক—এঁরা শূদ্র ছিলেন। প্রহ্লাদ, বিভীষণ প্রভৃতিরা অসুর তথা বৃত্রাসুর প্রভৃতিরা রাক্ষস ছিলেন। গজেন্দ্র, জটায়ু, কপোত-কপোতী প্রভৃতি পশু-পক্ষী ছিল। এদের সকলের মধ্যে যে বিশিষ্টতা ছিল তা কোনো বর্ণ, আশ্রম প্রভৃতিকে নিয়ে ছিল না, তা ছিল ভগবানের সম্বন্ধকে নিয়ে।* ভগবানের সম্বন্ধ স্বরূপের সঙ্গে, শরীরের সঙ্গে নয়। উচ্চ বর্ণ-আশ্রমের মানুষও যদি ভগবানের প্রতি বিমুখ হয় তাহলে তার ভাব ও আচরণ শুদ্ধ হয় না। ফলে তার বড় পতন হতে পারে; যেমন,—

---

* সৎসঙ্গেন হি দৈতেয়া মৃগাঃ খগাঃ।
গন্ধর্বাপ্সরসো নাগাঃ সিদ্ধাশ্চারণগুহ্যকাঃ।।
বিদ্যাধরা মনুষ্যেষু বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ স্ত্রিয়োঽন্ত্যজাঃ।
রজস্তমঃ প্রকৃতয়স্তস্মিংস্তস্মিন্ যুগেঽনঘ।।
বহবো মৎপদং প্রাপ্তাস্ত্বাষ্ট্রকায়াধবাদয়ঃ।
বৃষপর্বা বলির্বাণো ময়শ্চাথ বিভীষণঃ।।
সুগ্রীবো হনুমানৃক্ষো গজো গৃধ্রো বণিক্পথঃ।
ব্যাধঃ কুব্জা ব্রজে গোপ্যো যজ্ঞপত্ন্যস্তথাপরে।।
তে নাধীতশ্রুতিগণা নোপাসিতমহত্তমাঃ।
অব্রতাতপ্ততপসঃ সৎসঙ্গান্মামুপাগতাঃ।। (শ্রীমদ্ভাগবত ১০/১২/৩-৭)

ভগবান বললেন—'হে নিষ্পাপ উদ্ধব! এটি এক যুগের নয়। সকল যুগের কথা একই। সৎসঙ্গ (আমার সঙ্গে সম্বন্ধ)-এর দ্বারা দৈত্য, দানব, পশু-পক্ষী, গন্ধর্ব-অপ্সরা, নাগ-সিদ্ধ, চরণ-গুহক এবং বিদ্যাধরেরা আমাকে পেয়েছে। মানুষের মধ্যে বৈশ্য, শূদ্র, নারী এবং অন্ত্যজ প্রভৃতি রজোগুণী-তমোগুণী প্রকৃতির বহু রকমের প্রাণী আমার পরমপদ পেয়েছে। বৃত্রাসুর, প্রহ্লাদ, বৃষপর্ব, বলি, বাণাসুর, ময়দানব, বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান, জাম্বুবান, গজেন্দ্র, জটায়ু, তুলাধার বৈশ্য, ধর্মব্যাধ, কুব্জা, ব্রজের গোপীরা, যজ্ঞপত্নিরা এবং অন্যান্য লোকও সৎ-সঙ্গের প্রভাবে আমাকে লাভ করেছে। তারা বেদের স্বাধ্যায় করেনি, এবং বিধিপূর্বক মহাপুরুষদের উপাসনাও করেনি। তারা কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ন প্রভৃতি ব্রত এবং কোনো রকম তপস্যাও করেনি। শুধু সৎসঙ্গ অর্থাৎ আমার সম্বন্ধের প্রভাবে তারা আমাকে লাভ করেছে।'

যস্তু প্রব্রজিতো ভূত্বা পুনঃ সেবেত মৈথুনম্।
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি বিষ্ঠায়াং জায়তে কৃমিঃ।। (বায়ুপুরাণ)

'যে সন্ন্যাস-আশ্রমে যাওয়ার পর আবার নারীসঙ্গ করে সে ষাট হাজার বছর ধরে বিষ্ঠার কীট হয়ে থাকে।'

একটি হলো নীতিশাস্ত্র, একটি ধর্মশাস্ত্র এবং একটি মোক্ষশাস্ত্র। নীতি- শাস্ত্রে স্বার্থসিদ্ধি, ধর্মশাস্ত্রে বিধি-নিষেধ এবং মোক্ষশাস্ত্রে সৎ-অসৎ-এর বিবেক আছে। নীতি অপেক্ষা ধর্ম এবং ধর্ম অপেক্ষা মোক্ষশাস্ত্র বলবান। বর্ণ-আশ্রমের ব্যবস্থা ধর্মশাস্ত্রে আছে, মোক্ষশাস্ত্রে নেই। বর্ণ, আশ্রম প্রভৃতির সকল বিভেদ অসতের। সৎ-এর মধ্যে কোনো ভেদ নেই—**নেহ নানাস্তি কিঞ্চন** (কঠোপনিষদ্ ২/১/১১, বৃহদারণ্যক ৪/৪/১৯) '**একমেবাদ্বিতীয়ম্**' (ছান্দোগ্য. ৬/২/১)। যখন সৎ-অসৎ-এর বিবেক থাকবে সেখানে অসৎ-কে ত্যাগের প্রাধান্য থাকবে।* অতএব ব্রাহ্মণের শরীর হোক, শূদ্রের শরীর হোক—লোক ব্যবহারে তো তাদের মধ্যে পার্থক্য থাকবেই। কিন্তু পরমাত্ম-তত্ত্ব প্রাপ্তিতে কোন পার্থক্য থাকতেই পারে না। এর কারণ হলো পরমাত্ম-তত্ত্বের প্রাপ্তি শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করলেই হতে পারে। যার সঙ্গে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ করতে হবে, সেটি ভালো-খারাপ যাই হোক—তাতে কী এসে যায়?

কর্মানুসারে জীব নীচ যোনী থেকে ক্রমশঃ শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণও হতে পারে। আবার ক্রমশ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং নীচ যোনীতেও যেতে পারে। উচ্চ-নীচের এই ক্রম (গতি) কর্মানুসার ফলভোগের জন্য হয়, মুক্তিতে এরকম কোনো ক্রম নেই। অতএব শাস্ত্রে মুক্তি লাভের জন্য কোনো বিশেষ বর্ণ-আশ্রমের হলেই অধিকারী হয়, এমন উল্লেখ যদি থাকে তবে সেটি কোনো সিদ্ধান্ত নয়, বরং তা ব্যক্তি বিশেষের জন্যই বলা হয়েছে। ইতিহাসের আধারে সত্য নির্ণিত হতে পারে না; কেননা কে কোন্ পরিস্থিতিতে কী করেছে এবং কোন

---

* সুনহু তাত মায়া কৃত গুন অরু দোষ অনেক।
গুন যহ উভয় ন দেখিঅহিঁ দেখিঅ সো অবিবেক।।
(রামচরিতমানস ৭/৪১)

'গুণদোষদৃশির্দোষো গুণস্তূভয়বর্জিতঃ। (শ্রীমদ্ভাগবত ১১/১৯/৪৫)

পরিস্থিতিতে কী বলেছে এবং কেন বলেছে তা সম্পূর্ণ জানা যায় না। অতএব ইতিহাসে উল্লেখিত ভাল কথা মার্গ-দর্শনকারী হতে পারে, কিন্তু সত্য নির্ণয় বিধি-নিষেধ থেকে হয়। ইতিহাস অপেক্ষা বিধি প্রবল এবং বিধি অপেক্ষা নিষেধ প্রবল। অতএব এই রকমই করুন অথবা অন্য রকম করুন—এই বিষয়ে ইতিহাসকে প্রামাণিক মনে না করে বিধি-নিষেধকেই প্রমাণ মানতে হবে।

কলিযুগে ঠিক বিধি-বিধানানুসারে ব্রহ্মচর্য, গৃহস্থ এবং বানপ্রস্থ আশ্রম পালন করে সন্ন্যাস-আশ্রমে যাওয়া এবং সন্ন্যাস-আশ্রমের নিয়মগুলি পালন করা খুবই কঠিন। এজন্য শাস্ত্রে সন্ন্যাসকে কলিবর্জ্য (কলিযুগে বর্জিত) মনে করা হয়েছে।* যদি মনে করা হয় যে সন্ন্যাসী না হলে মানুষ কল্যাণ (মোক্ষের)-এর অধিকারী হতে পারে না তাহলে কলিযুগে কার কল্যাণ হবে?—বরং কলিযুগে কল্যাণ** হওয়া অন্য যুগের অপেক্ষা সুগম বলা হয়েছে।

বিষ্ণুপুরাণে একটি ঘটনার উল্লেখ আছে। একবার অনেক ঋষি শ্রেষ্ঠতা নির্ণয় করবার জন্য সমবেতভাবে বেদব্যাসের কাছে গিয়েছিলেন। বেদব্যাস আদর-আপ্যায়ন করে সকলকে বসতে দেন এবং নিজে গঙ্গায় স্নান করতে চলে যান। স্নান করতে করতে তিনি বলেছিলেন কলিযুগ, তুমি ধন্য; শূদ্র, তোমরাও ধন্য হও; নারী,

---

* অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্।
দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জযেৎ।।
(ব্রহ্মবৈবর্ত০ শ্রীকৃষ্ণ ১১৫/১১২-১১৩)

** যৎকৃতে দশভির্বর্ষৈস্ত্রেতায়াং হায়নেন তৎ।
দ্বাপরে তচ্চ মাসেন হ্যহোরাত্রেণ তৎকলৌ।।
(বিষ্ণুপুরাণ ৬/২/১৫)

যে ফল সত্যযুগে দশ বছর তপস্যা, ব্রহ্মচর্য, জপ প্রভৃতি করলে পাওয়া যায়, তা মানুষ ত্রেতায় এক বছরে, দ্বাপরে এক মাসে এবং কলিযুগে একটি দিন-রাত্রিতেই প্রাপ্ত করে নেয়।

কলিযুগ সম যুগ আন নহিঁ জৌ নর কর বিশ্বাস।
গাই রাম গুন গন বিমল ভব তর বিনহিঁ প্রয়াস।।
(শ্রীরামচরিতমানস ৭/১০৩ ক)

তোমরাও ধন্য হও।* তিনি যখন স্নান সমাপন করে ফিরে আসেন তখন ঋষিরা তাঁকে বলেছিলেন—মহারাজ! আপনি কেন কলিযুগকে, শূদ্রকে এবং নারীদের ধন্য বললেন? এ আমরা বুঝতে পারছি না। বেদব্যাস বললেন, কলিযুগে নিজ নিজ কর্তব্য পালন করার দ্বারা শূদ্র এবং নারীদের কাছে কল্যাণ তাড়াতাড়ি এবং সহজে এসে যায়। এজন্য এরা তিনজনই ধন্যবাদার্হ।

যে বর্ণ-আশ্রম যত উচ্চ তার কাছে ধর্ম পালনও ততটাই কঠিন। আর পতিত হলে আঘাত বেশি হয়, সমাজে লোকে উচ্চ শ্রেণীর মনে করার ফলে দেহাভিমানও অধিক হয়; অতএব কল্যাণও কঠিনতার দ্বারা হয়—

নীচ নীচ সব তর গয়ে, রাম ভজন লবলীন।
জাতিকে অভিমান সে, ডূবে সভী কুলীন।।
জাত নহীঁ জগদীশ কে, জন কে কৈসে হোয়।
জাত পাঁত কুল কীচ মেঁ, বন্ধ মরো মত কোয়।।

তাৎপর্য হলো লৌকিক ব্যবহারে (ভোজন, বিবাহ প্রভৃতিতে) জাতি, বর্ণ-আশ্রমের প্রাধান্য থাকে, কিন্তু ভগবৎ প্রাপ্তিতে ভাব এবং বিবেকই প্রধান। অতএব উচ্চ বর্ণ, আশ্রম প্রভৃতির দ্বারা সংসারে অধিকার লাভ হয়। কিন্তু ভগবানকে লাভ করবার অধিকার কেবল ভগবানের সম্বন্ধেই পাওয়া যায়। যেমন সব শিশুই মায়ের কোলে যাওয়ার অধিকারী, তেমনই ভগবানের অংশ হওয়ায় সকল জীব ভগবানকে লাভ করবার সমান অধিকারী। প্রত্যেক জীবেরই ভগবানের উপর পূর্ণ অধিকার আছে। অতএব ভগবৎ প্রাপ্তিতে কারও নিরাশ হওয়া উচিত নয়। সকল মানুষই পরমাত্মাতত্ত্বকে, মুক্তিকে, তত্ত্বজ্ঞানকে, কৈবল্যকে, ভগবৎ প্রেমকে, ভগবৎদর্শনকে** লাভ করবার অধিকারী।

---

* মগ্নোঽথ জাহ্নবীতোয়াদুত্থায়াহ সুতো মম।
শূদ্রস্সাধুঃ কলিস্সাধুরিত্যেবং শৃণ্বতাং বচঃ।।
তেষাং মুনীনাং ভূয়শ্চ মমজ্জ স নদীজলে।
সাধু সাধ্বিতি চোত্থায় শূদ্র ধন্যোঽসি চাব্রবীৎ।।
নিমগ্নশ্চ সমুত্থায় পুনঃ প্রাহ মহামুনিঃ।
যোষিতঃ সাধু ধন্যাস্তাস্তাভ্যো ধন্যতরোঽস্তি কঃ।। (বিষ্ণুপুরাণ ৬/২/৬-৮)

** ভগবানকে আপন মনে করার সকলের আধিকার আছে। অনন্যভাবে ভগবানকে আপন মনে করলে ভগবানের প্রতি প্রেম উৎপন্ন হয়।

এখানে 'বজ্রসূচি' নামক উপনিষদ দেওয়া হচ্ছে। মুক্তিক-উপনিষদে যেখানে একশ আটটি উপনিষদের নাম দেওয়া হয়েছে সেখানে এই উপনিষদেরও নাম আছে।*

---

* ঈশকেনকঠপ্রশ্নমুণ্ডমাণ্ডূক্যতিত্তিরিঃ।
ঐতরেয়ং চ ছান্দোগ্যং বৃহদারণ্যকং তথা।।
ব্রহ্মকৈবল্যজাবালশ্বেতাশ্বো হংস আরুণি।
গর্ভো নারায়ণো হংসো বিন্দুর্নাদশিরঃ শিখা।।
মৈত্রায়ণী কৌষীতকী বৃহজ্জাবালতাপনী।
কালাগ্নিরুদ্রমৈত্রেয়ী সুবালক্ষুরিমন্ত্রিকা।।
সর্বসারং নিরালম্বং রহস্যং বজ্রসূচিকম্।
তেজোনাদধ্যানবিদ্যাযোগতত্ত্বাত্মবোধকম্।।
পরিব্রাট্ ত্রিশিখী সীতা চূড়া নির্বাণমণ্ডলম্।
দক্ষিণা শরভং স্কন্দং মহানারায়ণাদ্বয়ম্।।
রহস্যং রামতপনং বাসুদেবং চ মুদ্গলম্।
শাণ্ডিল্যং পৈঙ্গলং ভিক্ষুমহচ্ছারীরকং শিখা।।
তুরীয়াতীতসন্ন্যাসপরিব্রাজাক্ষমালিকা।
অব্যক্তৈকাক্ষরং পূর্ণা সূর্যাক্ষ্যধ্যাত্মকুণ্ডিকা।।
সাবিত্র্যাত্মা পাশুপতং পরং ব্রহ্মাবধূতকম্।।
ত্রিপুরাতপনং দেবী ত্রিপুরা কঠভাবনা।
হৃদয়ং কুণ্ডলী ভস্ম রুদ্রাক্ষগণদর্শনম্।।
তারসারমহাবাক্যপঞ্চব্রহ্মাগ্নিহোত্রকম্।
গোপালতপনং কৃষ্ণং যাজ্ঞবল্ক্য বরাহকম্।।
শাট্যায়নী হয়গ্রীবং দত্তাত্রেয়ং চ গারুড়ম্।
কলিজাবালিসৌভাগ্যরহস্যঋচমুক্তিকা।।
এবমষ্টোত্তরশতং ভাবনাত্রয়নাশনম্।
জ্ঞানবৈরাগ্যদং পুংসাং বাসনাত্রয়নাশনম্।। (মুক্তিকোপনিষদ্)

(১) ঈশ, (২) কেন, (৩) কঠ, (৪) প্রশ্ন, (৫) মুণ্ডক, (৬) মাণ্ডুক্য, (৭) তৈত্তিরীয়, (৮) ঐতরেয়, (৯) ছান্দোগ্য, (১০) বৃদদারণ্যক, (১১) ব্রহ্ম, (১২) কৈবল্য, (১৩) জাবাল, (১৪) শ্বেতাশ্বতর, (১৫) হংস, (১৬) আরুণিক, (১৭) গর্ভ, (১৮) নারায়ণ, (১৯) পরমহংস, (২০) অমৃতবিন্দু, (২১) অমৃতনাদ, (২২) অথর্বশিরস্, (২৩) অথর্বশিখা, (২৪) মৈত্রায়ণী, (২৫) কৌষীতকিব্রাহ্মণ, (২৬) বৃহজ্জাবাল, (২৭) নৃসিংহতাপনীয়, (২৮) কালাগ্নিরুদ্র, (২৯) মৈত্রয়ী, (৩০) সুবাল, (৩১) ক্ষুরিকা, (৩২) মন্ত্রিকা, (৩৩) সর্বসার, (৩৪) নিরালম্ব, (৩৫) শুকরহস্য, (৩৬) বজ্রসূচিকা, (৩৭) তেজোবিন্দু (৩৮) নাদবিন্দু, (৩৯) ধ্যানবিন্দু, (৪০) ব্রহ্মবিদ্যা, (৪১) যোগতত্ত্ব, (৪২) আত্মপ্রবোধ, (৪৩) পারদপরিব্রাজক, (৪৪) ত্রিশিখিব্রাহ্মণ, (৪৫) সীতা, (৪৬) যোগচূড়ামণি, (৪৭) নির্বাণ, (৪৮) মণ্ডলব্রাহ্মণ, (৪৯) দক্ষিণামূর্তি, (৫০) শরভ, (৫১) স্কন্দ, (৫২) ত্রিপাদ্বিভূতিমহানারায়ণ, (৫৩) অদ্বয়তারক, (৫৪) রামরহস্য (৫৫)

বজ্রসূচিকোপনিষদ্

শান্তি পাঠ

ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথো বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্বাণি। সর্বং ব্রহ্মোপনিষদং মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ অনিরাকরণমস্তু নিরাকরণং মেঽস্তু। তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্মাস্তে ময়ি সন্তু তে ময়ি সন্তু।।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

'হে পরব্রহ্ম পরমাত্মন্! আমার সকল অঙ্গ, বাণী, প্রাণ, নেত্র, কর্ণ এবং সব ইন্দ্রিয় তথা শক্তি যেন পরিতুষ্ট হয়। এই-যে সর্বরূপ উপনিষদ্-প্রতিপাদিত ব্রহ্ম তাকে যেন আমি অস্বীকার না করি এবং সেই ব্রহ্ম যেন আমাকে পরিত্যাগ না করেন। তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ অটুট হোক এবং আমার সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধও অটুট হোক। উপনিষদে প্রতিপাদিত যে ধর্মসমূহ আছে, সেগুলি পরমাত্মায় তল্লীন আমাতে হোক, সেগুলি সব আমাতে হোক। হে পরমাত্মন্! ত্রিবিধ তাপের শান্তি হোক।'

চিৎসদানন্দরূপায় সর্বধীবৃত্তিসাক্ষিণে।
নমো বেদান্তবেদ্যায় ব্রহ্মণেঽনন্তরূপিণে।।

'সচ্চিদানন্দস্বরূপ, সকলের বুদ্ধির সাক্ষী, বেদান্তের দ্বারা জানার যোগ্য এবং অনন্ত রূপধারী ব্রহ্মকে আমি নমস্কার করছি।'

ওঁ বজ্রসূচীং প্রবক্ষ্যামি শাস্ত্রমজ্ঞানভেদনম্।
দূষণং জ্ঞানহীনানং ভূষণং জ্ঞানচক্ষুষাম্।।

রামতাপনীয়, (৫৬) বাসুদেব, (৫৭) মুদ্গল, (৫৮) শাণ্ডিল্য, (৫৯) পৈঁগল, (৬০) ভিক্ষুক, (৬১) মহৎ, (৬২) শারীরক, (৬৩) যোগশিখা, (৬৪) তুরীয়াতীত, (৬৫) সন্ন্যাস, (৬৬) পরমহংসপরিব্রাজক, (৬৭) অক্ষমালা, (৬৮) অব্যক্ত, (৬৯) একাক্ষর, (৭০) অন্নপূর্ণা, (৭১) সূর্য, (৭২) অক্ষি, (৭৩) অধ্যাত্ম, (৭৪) কুণ্ডিকা, (৭৫) সাবিত্রী, (৭৬) আত্মা, (৭৭) পাশুপত, (৭৮) পরব্রহ্ম, (৭৯) অবধূত, (৮০) ত্রিপুরাতাপনীয়, (৮১) দেবী, (৮২) ত্রিপুরা, (৮৩) কঠরুদ্র, (৮৪) ভাবনা, (৮৫) রুদ্রহৃদয়, (৮৬) যোগকুণ্ডলী, (৮৭) ভস্মজাবাল, (৮৮) রুদ্রজাবাল, (৮৯) গণপতি, (৯০) জাবালদর্শন, (৯১) তারসার, (৯২) মহাবাক্য, (৯৩) পঞ্চব্রহ্ম, (৯৪) প্রাণাগ্নিহোত্র, (৯৫) গোপালতাপনীয়, (৯৬) কৃষ্ণ, (৯৭) যাজ্ঞবল্ক্য, (৯৮) বরাহ, (৯৯) শাট্যায়নীয়, (১০০) হয়গ্রীব, (১০১) দত্তাত্রেয়, (১০২) গরুড়, (১০৩) কলিসন্তরণ (১০৪) জাবালি, (১০৫) সৌভাগ্যলক্ষ্মী, (১০৬) সরস্বতীরহস্য (১০৭) বহ্বৃচ, (১০৮) মুক্তিকোপনিষদ্—

এই একশ আটটি উপনিষদে মানুষের আধিদৈবিক, আধিভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক তিন তাপ বিনষ্ট হয়। এগুলির পাঠ ও স্বাধ্যায়ে জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রাপ্তি হয় তথা লোকবাসনা, শাস্ত্রবাসনা এবং দেহবাসনারূপ ত্রিবিধ বাসনার বিনাশ হয়।

'এখন আমি অজ্ঞানতার বিনাশকারী ব্রহ্মসূচী নামক শাস্ত্র বলছি, যা অজ্ঞানীদের কাছে দূষণরূপ এবং জ্ঞানচক্ষুস্মানের কাছে ভূষণরূপ।'

ব্রহ্মক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রা ইতি চত্বারো বর্ণাস্তেষাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণ এব প্রধান ইতি বেদবচনানুরূপং স্মৃতিভিরপ্যুক্তম্। তত্র চোদ্যমস্তি কো বা ব্রাহ্মণো নাম কিং জীবঃ কিং দেহঃ কিং জাতিঃ কিং জ্ঞানং কিং কর্ম কিং ধার্মিক ইতি।।

'ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—এই চারটি বর্ণ। সেই বর্ণগুলির মধ্যে ব্রাহ্মণ প্রধান, এমন কথা বেদে এবং স্মৃতিতে বলা আছে। এই বিষয়ে সংশয় জাগে যে ব্রাহ্মণ কার নাম? জীব কি ব্রাহ্মণ? দেহ কি ব্রাহ্মণ? জাতি কি ব্রাহ্মণ? জ্ঞান কি ব্রাহ্মণ? কর্ম কি ব্রাহ্মণ? অথবা ধার্মিক ব্যক্তি ব্রাহ্মণ?

তত্র প্রথমো জীবো ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তন্ন। অতীতানাগতানেকদেহানাং জীবস্যৈকরূপত্বাদেকস্যাপি কর্মবশাদনেকদেহসম্ভবাৎ সর্বশরীরাণাং জীবস্যৈকরূপত্বাচ্চ। তস্মান্ন জীবো ব্রাহ্মণ ইতি।।

'জীব ব্রাহ্মণ—তা হতে পারে না। কারণ হলো, অতীতে হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে এমন অনেক শরীরে জীব এক রূপেই থাকে। জীব একই রূপে থাকা সত্ত্বেও কর্মের ফলে অনেক শরীর ধারণ করতে থাকে, কিন্তু সমস্ত শরীরেই জীবন সেই একই থাকে।' (অতএব জীবকে যদি ব্রাহ্মণ মানা হয় তাহলে সমস্ত শরীরকে ব্রাহ্মণ মানতে হবে)।

তর্হি দেহো ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তন্ন। আচাণ্ডালাদিপর্যন্তানাং মনুষ্যাণাং পাঞ্চভৌতিকত্বেন দেহস্যৈকরূপত্বাজ্জরামরণধর্মাধর্মাদিসাম্যদর্শনাদ্-ব্রাহ্মণঃ শ্বেতবর্ণঃ ক্ষত্রিয়ো রক্তবর্ণো বৈশ্যঃ পীতবর্ণঃ শূদ্রঃ কৃষ্ণবর্ণ ইতি নিয়মাভাবাৎ। পিত্রাদিশরীরদহনে পুত্রাদিনাং ব্রহ্মহত্যাদিদোষসম্ভবাচ্চ। তস্ম্যান্ন দেহো ব্রাহ্মণ ইতি।

'তাহলে কি দেহ ব্রাহ্মণ? না এমনও হতে পারে না। চণ্ডাল থেকে আরম্ভ করে মানুষ পর্যন্ত সকলের শরীর পাঞ্চভৌতিক হওয়ায় একরূপ। জরা-মৃত্যু, ধর্ম-অধর্ম (পুণ্য-পাপ) প্রভৃতিও সকলের মধ্যে সমান দেখা যায়। ব্রাহ্মণের শ্বেতবর্ণ, ক্ষত্রিয়ের লোহিত বর্ণ, বৈশ্যের হলুদ বর্ণ এবং শূদ্রের কাল বর্ণ হয়ে থাকে—এমন কোনো নিয়ম নেই। যদি দেহকে ব্রাহ্মণ মনে করা হয় তাহলে পিতা প্রভৃতির মৃত শরীরকে পোড়ালে পুত্রদের ব্রহ্মহত্যা ইত্যাদির পাপ হওয়ার সম্ভাবনা। অতএব দেহ ব্রাহ্মণ নয়।'

তর্হি জাতির্ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তন্ন। তত্র জাত্যন্তরজন্তুষনেকজাতিসম্ভবা

মহর্ষয়ো বহবঃ সন্তি। ঋষ্যশৃঙ্গো মৃগ্যাঃ, কৌশিকঃ কুশাৎ, জাম্বুকো জম্বুকাৎ, বাল্মীকো বল্মীকাৎ, ব্যাসঃ কৈবর্তকন্যকায়াম্, শশপৃষ্ঠাদ্ গৌতমঃ, বশিষ্ঠ উর্বশ্যাম্, অগস্ত্যঃ কলশে জাত ইতি শ্রুতত্বাৎ। এতেষাং জাত্যা বিনাপ্যগ্রে জ্ঞানপ্রতিপাদিতা ঋষয়ো বহবঃ সন্তি। তস্মান্ন জাতির্ব্রাহ্মণ ইতি।

'তবে কি জাতি ব্রাহ্মণ? না, তাও হতে পারে না। বিভিন্ন জাতির প্রাণীদের অনেক জাতিবিশিষ্ট বহু মহর্ষির জন্ম হয়েছে; যেমন, মৃগ থেকে ঋষ্যশৃঙ্গ, কুশ থেকে কৌশিক, জম্বু (শৃগাল) থেকে জাম্বুক, বল্মীক থেকে বাল্মীকি, মৎস্যকন্যা থেকে ব্যাস, শশপৃষ্ঠ (খরগোসের পিঠ) থেকে গৌতম, উর্বশী থেকে বশিষ্ঠ, কলস (ঘট) থেকে অগস্ত উৎপন্ন হয়েছেন—এমন কথা শোনা যায়। এদের মধ্যে জাতি ছাড়াও অনেক পূর্ণ জ্ঞানবান ঋষি হয়েছেন। অতএব জাতি ব্রাহ্মণ নয়।'

তর্হিং জ্ঞানং ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তন্ন। ক্ষত্রিয়াদয়োঽপি পরমার্থদর্শিনোঽভিজ্ঞা বহবঃ সন্তি। তস্মান্ন জ্ঞানং ব্রাহ্মণ ইতি।

'তবে কি জ্ঞান ব্রাহ্মণ? না, তাও হতে পারে না। অনেক ক্ষত্রিয় (জনক, অশ্বপতি প্রভৃতি) পরমার্থকে জ্ঞাত তত্ত্বজ্ঞ হয়েছেন? অতএব জ্ঞান ব্রাহ্মণ নয়।'

তর্হি কর্ম ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তন্ন। সর্বেষাং প্রাণিনাং প্রারব্ধসঞ্চিতাগামিকর্মসাধর্ম্যদর্শনাৎকর্মাভিপ্রেরিতাঃ সন্তো জনাঃ ক্রিয়াঃ কুর্বন্তীতি। তস্মান্ন কর্ম ব্রাহ্মণ ইতি।

'তবে কি কর্ম ব্রাহ্মণ? না, এরকমও হতে পারে না। সকল প্রাণীর ভাগ্য, সঞ্চিত তথা ক্রিয়মান কর্মে সধর্মতা দেখা যায়। আর কর্মের দ্বারা প্রেরিত হয়ে ঐ মানুষেরা ক্রিয়া করে। অতএব কর্ম ব্রাহ্মণ নয়।'

তর্হি ধার্মিকো ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তন্ন। ক্ষত্রিয়াদয়ো হিরণ্যদাতারো বহবঃ সন্তি। তস্মান্ন ধার্মিকো ব্রাহ্মণ ইতি।

'তবে কি ধার্মিক ব্যক্তি ব্রাহ্মণ? না, এমনও হতে পারে না। অনেক ক্ষত্রিয় প্রভৃতিরাও স্বর্ণ দান করেছেন। অতএব ধার্মিক ব্যক্তি ব্রাহ্মণ নন।'

তর্হি কো বা ব্রাহ্মণো নাম। যঃ কশ্চিদাত্মানদ্বিতীয়ং জাতিগুণক্রিয়াহীনং ষড়ূর্মিষড়্ভাবেত্যাদিসর্বদোষরহিতং সত্যজ্ঞানানন্দানন্তস্বরূপং স্বয়ং নির্বিকল্পমশেষকল্পধারমশেষভূতান্তর্যামিত্বেন বর্তমানমন্তর্বহিশ্চাকাশ-বদনুস্যূতমখণ্ডানন্দস্বভাবমপ্রমেয়মনুভবৈকবেদ্যমপরোক্ষতয়া ভাসমানং কর-তলামলকবৎসাক্ষাদপরোক্ষীকৃত্য কৃতার্থতয়া কামরাগাদিদোষরহিতঃ শমদমা-দিসম্পন্নভাবমাৎসর্যতৃষ্ণাশামোহাদিরহিতো দম্ভাহংকারাদিভিরসং

স্পৃষ্টচেতা বর্তত এবমুক্তলক্ষণো যঃ স এবং ব্রাহ্মণ ইতি শ্রুতিস্মৃতি পুরাণেতিহা-সানামভিপ্রায়ঃ। অন্যথা হি ব্রাহ্মণত্বসিদ্ধির্নাস্ত্যেব।।

'তাহলে কার নাম ব্রাহ্মণ? যে অদ্বিতীয় আত্মা, জাতি, গুণ তথা ক্রিয়া রহিত, ছটি পীড়া তথা ছটি বিকার* প্রভৃতি দোষ থেকে মুক্ত, সৎ-চিৎ-আনন্দ এবং অনন্তস্বরূপ স্বয়ং নির্বিকল্প, অনন্ত কল্পের আধার, অনন্ত প্রাণীদের মধ্যে অন্তর্যামীরূপে স্থিত, সদা বর্তমান (নিত্য অবস্থান করে), আকাশের মতো সকলের ভিতরে-বাইরে পরিপূর্ণ, অখণ্ড আনন্দ স্বভাববিশিষ্ট, অপ্রমেয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণের বিষয়ভূত নয়, যাকে কেবল অনুভবের দ্বারা জানা যায় তথা অপরোক্ষরূপে প্রকাশমান সেই পরমাত্মতত্ত্বকে হস্তে আমলকির ন্যায় সাক্ষাৎ করে যিনি কৃতকৃত্য। (জ্ঞাত-জ্ঞাতব্য, প্রাপ্ত-প্রাপ্তব্য) হয়ে গিয়েছেন এবং যিনি কাম-আসক্তি প্রভৃতি দোষমুক্ত; শম, দম প্রভৃতির দ্বারা সম্পন্ন ; মাৎসর্য, তৃষ্ণা, বাসনা, মোহ প্রভৃতি থেকে মুক্ত এবং যাঁর চিত্ত দম্ভ, অহঙ্কার প্রভৃতি দোষগুলি থেকে নির্লিপ্ত, তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ—এই হচ্ছে শ্রুতি, স্মৃতি এবং ইতিহাসের অভিপ্রায়। এ ছাড়া অন্য কোনো ভাবে ব্রাহ্মণ্যত্ত্ব সিদ্ধ হয় না।'

সচ্চিদানন্দমাত্মানমদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম ভাবয়েদাত্মানং সচ্চিদানন্দং ব্রহ্ম ভাবয়েদিত্যুপনিষৎ।।

'আত্মা সচ্চিদানন্দস্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম (তাকে যিনি সাক্ষাৎ করেন তিনি ব্রাহ্মণ)—এরকম মনে করা উচিত। আত্মাকে সচ্চিদানন্দস্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম মনে করা উচিত। এইটি হলো উপনিষদ্।'

বজ্রসূচিকোপনিষদ্ সমাপ্ত।।

শান্তি পাঠ

'ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথো বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্বাণি। সবং ব্রহ্মৌপনিষদং মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য়াং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ অনিরাকরণমস্ত্বনিরাকরণং মেঽস্তু। তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্মাস্তে ময়ি সন্তু তে ময়ি সন্তু।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

❁ ❁ ❁

* ক্ষুধা, পিপাসা, শোক, মোহ, জন্ম এবং মৃত্যু—এই ছটি হলো পীড়া। সৃষ্ট হওয়া, সত্তাযুক্ত দেখা, বদলে যাওয়া, বৃদ্ধি হওয়া, ক্ষয় ও নষ্ট হওয়া এগুলি ছটি বিকার।

(৯) অবিনাশী রস

উপনিষদে আছে—'রসৌ বৈ সঃ' (তৈত্তেরীয় ২/৭) 'সেই পরমাত্মতত্ত্ব রসস্বরূপ।' তাৎপর্য হলো, রস পরমাত্মতত্ত্বেই আছে, যা শান্ত, অখণ্ড এবং অনন্ত। এই পরমাত্মতত্ত্বের অংশ হওয়ায় জীবাত্মাতেও সেই রস স্বতঃ স্বাভাবিক—

ঈশ্বর অংস জীব অবিনাসী। চেতন অমল সহজ সুখ রাসী।।

(রামচরিতমানস ৩/১১৭/১)

কিন্তু শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধের গুরুত্ব মুখ্য হওয়ায় জীবাত্মা এই রসকে সাংসারিক ভোগ, ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলিতে পরিলক্ষিত করে অর্থাৎ তার ভোগে রসবুদ্ধি হয়ে যায়। ভোগের এই রস বিনাশশীল আর পরমাত্মার রস অবিনাশী। তাই ভোগের রস নীরসতায় বদলে যায় এবং তার অবসান হয়। কিন্তু পরমাত্মার রস সদা সর্বদা সরস থাকে এবং বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ভোগের রসের দুটি অবস্থা হয়—সংযোগ (সম্ভোগ) এবং বিয়োগ (বিপ্রলব্ধ)। এই দুটির মধ্যে সংযোগ রস অপেক্ষা বিয়োগ রস শ্রেষ্ঠ ; কেননা বিয়োগেই যে রস পাওয়া যায় তা সংযোগে পাওয়া যায় না। যেমন, যতক্ষণ খাদ্য পাওয়া না যায় ততক্ষণ 'খাদ্য পরিবেশিত হবে'—এই (পাওয়ায় লালসা)-তে যা সুখ তা খাদ্য পেলে থাকে না, বরং প্রত্যেক গ্রাসে তা ক্ষীণ হতে হতে শেষে তা সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে যায় এবং ভোজনে অরুচি হয়ে যায়। কিন্তু পরমাত্মার রস এ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তা সংযোগ-বিয়োগ দুটি অবস্থাতেই সমানভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তা কমেও না, শেষ হয়েও যায় না।

ভোগের সত্তা এবং গুরুত্ব মেনে নিলে ভিতরে ভোগের প্রতি এক সূক্ষ্ম আকর্ষণ, প্রিয়তা, মিষ্টতা সৃষ্টি হয়। তার নাম 'রস'। কোনোও লোভী মানুষ যদি টাকা পায় এবং কোনো কামী মানুষ যদি স্ত্রীলোক পায় তাহলে মনে মনে তারা খুশী হয়, এইটিই হলো 'রস'। ভোগ করার

পর মানুষ বলে যে 'বেশ মজা হয়েছে'। এইটি হলো তার রসের স্মৃতি। এই রস অহং (চিজ্জড়গ্রন্থি)-তে থাকে। এই রসেরই স্থূল রূপ হলো অনুরাগ, সুখাসক্তি।

যতক্ষণ পর্যন্ত রসবুদ্ধি থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃতি এবং তার কার্য (ক্রিয়া এবং পদার্থ)-এর অধীনতা থাকে। রসবুদ্ধি নিবৃত্ত হলে পরাধীনতা দূর হয়, ভোগের জন্য সুখের পরাধীনতা থাকে না, অন্তরে ভোগের দাসত্ব থাকে না।

ভোগের রসগুলির মধ্যে জননেন্দ্রিয়ের রসকে খুব প্রবল মানা হয়েছে। তাই কামকে জয় করা বড়ই কঠিন। সংসারে টাকা-পয়সার ক্ষেত্রে সৎ মানুষ পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু নারী সম্পর্কে সৎ মানুষ পাওয়া অপেক্ষাকৃত কঠিন। সৎ মানুষ কারো লক্ষ লক্ষ টাকা নিজের কাছে সুরক্ষিত রাখতে পারে। কিন্তু কারও স্ত্রীকে নিজের কাছে সুরক্ষিত রাখা, বিচলিত না হওয়া খুবই কঠিন।

ভতৃহরি লিখেছেন—

বিশ্বামিত্রপরাশরপ্রভৃতয়ো বাতাম্বুপর্ণাশনা—
স্তেঽপি স্ত্রীমুখপঙ্কজং সুললিতং দৃষ্টৈব মোহং গতা।।
শাল্যন্নং সঘৃতং পয়োদধিয়ুতং ভুঞ্জন্তি যে মানবা—
স্তেষামিন্দ্রিয়নিগ্রহো যদি ভবেদ্বিন্ধ্যস্তরেৎ সাগরে।।

'যাঁরা বায়ু ভক্ষণ করে, জল পান করে এবং শুকনো পাতা খেয়ে বাস করতেন সেই বিশ্বামিত্র, পরাশর প্রভৃতিও সুন্দর স্ত্রী-মুখ দেখে মোহগ্রস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। তাহলে যেসব মানুষ পুষ্টিকর খাবার সুগন্ধিত ঘি, দুধ এবং দই দিয়ে খান তাঁরা যদি তাঁদের ইন্দ্রিয়কে নিগ্রহ করতে পারেন তাহলে মনে করবেন যে বিন্ধ্যপর্বত সমুদ্রে সাঁতার কাটছে।'

মত্তেভকুম্ভদলনে ভুবি সন্তি শূরাঃ
কেচিৎ প্রচণ্ডমৃগরাজবধেঽপি দক্ষাঃ।
কিন্তু ব্রবীমি বলিনাং পুরতঃ প্রসহ্য
কন্দর্পদর্পদলনে বিরলা মনুষ্যাঃ।।

'এই পৃথিবীতে কিছু লোক এমন বীর আছেন যাঁরা মত্ত হাতির মস্তক বিদীর্ণ করতে পারেন এবং কিছু লোক আছেন যাঁরা ভীষণ শক্তিশালী

সিংহকে মারতে পারেন। কিন্তু এই রকম বলবান মানুষদের আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলছি যে কামদেবের সম্মোহকে চূর্ণ করবার মতো মানুষ বিরল।'

এই রকম জননেন্দ্রিয়ের রসও রসবুদ্ধি নিবৃত্ত হওয়ার পর সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যায়। তার কারণ কাম যতই শক্তিশালী হোক তা বিনাশশীল। কামকে জয় করা যত কঠিনই হোক তা অসম্ভব নয়। কঠিনও তার কাছে—যে শরীরাদি সৃষ্টি ও বিনাশশীল বস্তুগুলিকে সত্তা ও গুরুত্ব দিয়ে থাকে। যদি সাধক শরীরের মধ্যে নিজের স্থিতিকে মেনে নেন তাহলে কাম তাঁকে জ্বালাবে। যদি তিনি স্বরূপের (কেবল সত্তার) মধ্যে নিজের বাস্তবিক স্থিতি চিনে নেন তাহলে কাম নষ্ট হয়ে যাবে ; কেননা স্বরূপে (সত্তায়) কাম, ক্রোধ প্রভৃতি কোনো বিকার নেই। কেননা স্বরূপে কোনো অল্পতাই নেই। তা পূর্ণ। তাহলে তাতে কাম আসবে কি করে?

রসবুদ্ধির অবস্থিতিতে যখন ভোগের প্রাপ্তি হয় তখন মানুষের হৃদয় দুর্বল হয়ে যায় এবং সে ভোগের বশীভূত হয়ে যায়। কিন্তু রসবুদ্ধি নিবৃত্ত হওয়ার পর যখন ভোগ প্রাপ্ত হয় তখন তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষের হৃদয়ে বিন্দুমাত্র কোনো বিকার হয় না। তাঁর অন্তরে এমন কোনো বৃত্তি সৃষ্টি হয় না যাতে ভোগ তাঁকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে পারে। যেমন কোনো পশুর সামনে টাকার থলি রেখে দিলে তার মধ্যে লোভ-বৃত্তির জন্ম হয় না, তেমনই সুন্দরী নারী দেখে তাঁর কাম-বৃত্তি হয় না। পশু তো টাকা-পয়সা এবং নারীকে জানে না। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষ টাকাও চেনেন, নারীকেও চেনেন। যেমন আমরা আঙ্গুল দিয়ে শরীরের কোনো অংশ চুলকালে চুলকানি থামলে আঙ্গুলের কোনো তফাৎ হয় না, কোনো বিকৃতি হয় না, তেমনই ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা বিষয়ের সেবন হওয়ার পর তত্ত্বজ্ঞের হৃদয়ে কোনো বিকার হয় না, তা যেমনকার তেমনই নির্বিকার থাকে। তার কারণ রসবুদ্ধি নিবৃত্ত হয়ে গেলে তিনি সুখের জন্য কোনো বিষয়ে প্রবৃত্ত হন না। তাঁর প্রত্যেক প্রবৃত্তি অপরের কল্যাণ ও সুখের জন্য নিযুক্ত হয়। নিজের সুখের জন্য বিষয়গুলির

চিন্তা পতন ঘটায়।* আর নিজের জন্য না করা বিষয়গুলির সেবন মুক্তিকারী হয়ে থাকে।**

যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তঃকরণে বিন্দুমাত্র ভোগের সত্তা এবং গুরুত্ব থাকে, ভোগে রসবুদ্ধি থাকে, ততক্ষণ পরমাত্মার অলৌকিক রস প্রকট হয় না। বাইরে থেকে বিষয়ের সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ করলে অর্থাৎ ভোগকে ত্যাগ করলেও অন্তরে রসবুদ্ধি থেকে যায়। তত্ত্ববোধ হলে এই রসবুদ্ধি শুকিয়ে যায়, নিবৃত্ত হয়ে যায়—

বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে।।

(গীতা ২/৫৯)

'নিরাহারী'+ (যিনি বিষয়গুলি থেকে ইন্দ্রিয়গুলিকে সরিয়ে নিয়েছেন) মানুষেরও তো বিষয় নিবৃত্ত হয়ে যায়, কিন্তু রসবুদ্ধি নিবৃত্ত হয় না। কিন্তু পরমাত্মতত্ত্ব উপলব্ধ হলে স্থিত প্রজ্ঞ পুরুষের রসবুদ্ধিও নিবৃত্ত হয়ে যায়।

---

* ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎক্রোধোঽভিজায়তে।।
ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎস্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণস্যতি।। (গীতা ২/৬২-৬৩)

'যে ব্যক্তি বিষয় চিন্তা করে তার সেই বিষয়ে আসক্তি জন্মায়। আসক্তি থেকে কামনার সৃষ্টি হয়। কামনা থেকে ক্রোধ উৎপন্ন হয়, ক্রোধ থেকে হয় সম্মোহ (মূঢ়তা)। সম্মোহ থেকে স্মৃতিভ্রংশ হয়ে যায়। স্মৃতিভ্রংশ হলে বুদ্ধি নাশ হয়। বুদ্ধি নাশ হলে মানুষের পতন হয়।'

** রাগদ্বেষবিয়ুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি।।
প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হাসিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে ।। (গীতা ২/৬৪-৬৬)

'যে সাধকের অন্তঃকরণ বশীভূত, তিনি রাগদ্বেষ থেকে মুক্ত হয়ে নিজের বশীভূত ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা বিষয়গুলির সেবন করতে করতে অন্তঃকরণের প্রসন্নতাকে লাভ করেন। প্রসনতার ফলে সাধকের সকল দুঃখের বিনাশ হয়ে যায় এবং এই রকম প্রসন্ন হৃদয়বিশিষ্ট সাধকের বুদ্ধি নিঃসন্দেহে খুব তাড়াতাড়ি পরমাত্মাতে স্থির হয়ে যায়।'

\+ ইন্দ্রিয়ের বিষয় হলো ইন্দ্রিয়ের আহার্য। সেই বিষয়গুলি থেকে যিনি নিজের ইন্দ্রিয়কে সরিয়ে নিয়েছেন তাঁকেই এখানে 'নিরাহারী' বলা হয়েছে।

তাৎপর্য হলো সংসার থেকে নিজের ভিন্নতা এবং পরমাত্মা থেকে নিজের অভিন্নতা যখন অনুভূত হয় তখন বিনাশশীল (সংসর্গজনিত) রসের নিবৃত্তি হয়ে যায়। বিনাশশীল রসের নিবৃত্তি হয়ে গেলে অবিনাশী (শান্ত, অখণ্ড এবং অনন্ত) রসের জাগৃতি হয়ে যায়।

তত্ত্ববোধ হলে তো রস সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হয়ে যায়, কিন্তু তত্ত্ববোধ হওয়ার আগেও উপেক্ষার দ্বারা, বিচার, সৎসঙ্গ, সাধু কৃপার দ্বারা রস নিবৃত্ত হতে পারে। যাঁর রসবুদ্ধি নিবৃত্ত হয়ে গিয়েছে এমন তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষের সঙ্গ থেকেও রস নিবৃত্ত হয়ে যায়।

কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ—তিনটি সাধনার দ্বারাই রসের নিবৃত্তি হয়। যখন কর্মযোগে সেবার রস, জ্ঞানযোগে তত্ত্বকে উপলব্ধি করার রস এবং ভক্তিযোগে ভগবৎ স্মরণের রস পাওয়া শুরু হয় তখন বিনাশশীল রস নিজে থেকেই দূর হয়ে যায়। যেমন, ছোটবেলায় খেলনাতে রস পাওয়া যেত, কিন্তু বড় হওয়ার পর যখন টাকা-পয়সার রস পাওয়া শুরু হয় তখন খেলনার রস স্বতঃই দূর হয়ে যায়, তেমনই সাধনার রস পেয়ে গেলে ভোগের রস নিজে থেকেই দূরীভূত হয়।

❁ ❁ ❁

(১০) কর্মযোগের দ্বারা কল্যাণ

পরমাত্মার সঙ্গে জীবের নিত্যযোগ অর্থাৎ নিত্য-সম্বন্ধ। গীতা এই নিত্যযোগকেই 'যোগ' নামে অভিহিত করেছেন। এই যোগের কখনও বিচ্ছেদ হয় না। কিন্তু যখন জীব জড় প্রকৃতির কার্য শরীরের সঙ্গে নিজের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করে, তখন সে এই নিত্য-যোগের প্রতি বিমুখ হয়ে যায়, একে ভুলে যায়। জড়ের সঙ্গে স্থাপিত এই সম্বন্ধকেই 'অহং' (গ্রন্থিরূপ অহঙ্কার) বলা হয়। যদিও জীবের প্রকৃতি এবং প্রকৃতির কার্যের সঙ্গে নিত্য- বিচ্ছেদ আছে, তবু তার সঙ্গে নিজের সংযোগ মেনে নেওয়ার কারণে সে নিত্য-যোগের মধ্যে বিচ্ছেদ এবং নিত্য-বিচ্ছেদের মধ্যে সংযোগ দেখতে থাকে। অর্থাৎ সে নিত্য প্রাপ্ত পরমাত্মাকে অপ্রাপ্তই দেখে এবং নিত্য-নিবৃত্ত শরীর-সংসারকে প্রাপ্তই দেখে থাকে। এই ভুলকে দূর করবার জন্য ভগবান তিনটি প্রধান যোগ-সাধনার বর্ণনা করেছেন—'কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ।'*

যতক্ষণ পর্যন্ত অহং থাকে ততক্ষণ সাধকদের মধ্যে এবং তাঁদের সাধনায় বিভিন্নতা থাকে। কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ—এই তিনটি ভিন্নতাও অহং-এর কারণবশত হয়। অহং দূর হয়ে গেলে অর্থাৎ সাধনা সিদ্ধ হলে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগের বিভেদ সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে যায়।

কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ—এই তিনটি সাধনার মধ্যে জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগের প্রচার বেশি, কর্মযোগের প্রচার খুবই কম। ভগবানও গীতায় বলেছেন যে 'দীর্ঘ সময় চলে যাওয়ার ফলে কর্মযোগ

---

* যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তাঃ নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ।।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১/২০/৬)

'নিজেদের কল্যাণকামী মানুষদের জন্য আমি তিনটি যোগমার্গ জানিয়েছি—জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ এবং ভক্তিযোগ। এই তিনটি ছাড়া কল্যাণমার্গের অন্য কোনো পথ নেই।'

এখন মনুষ্যলোকে লুপ্তপ্রায় হয়ে গিয়েছে।'—'**স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ**' (৪/২)। এইজন্য কর্মযোগের সম্পর্কে এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে এটি পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তির স্বতন্ত্র সাধনা নয়। তাই কর্মযোগ অনুসরণকারী সাধক হয় জ্ঞানযোগ গ্রহণ করেন নয়তো ভক্তিযোগ। যেমন—

তাবৎ কর্মাণি কুর্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে।।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১/২০/৯)

'যতক্ষণ পর্যন্ত না ভোগের প্রতি বৈরাগ্য হচ্ছে (জ্ঞানযোগের অধিকারী না হচ্ছে) অথবা আমার লীলাকাহিনী শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা হচ্ছে (ভক্তিযোগের অধিকারী না হচ্ছে) ততক্ষণ পর্যন্ত কর্ম করে যাওয়া উচিত।'

আদৌ স্ববর্ণাশ্রমবর্ণিতাঃ ক্রিয়াঃ
কৃত্বা সমাসাদিতশুদ্ধমানসঃ।
সমাপ্য তৎপূর্বমুপাত্তসাধনঃ
সমাশ্রয়েৎ সৎগুরুমাত্মলব্ধয়ে।।

(অধ্যাত্মরামায়ণ-উত্তর-৫/৭)

'সর্বপ্রথম নিজের বর্ণ এবং আশ্রমের জন্য শাস্ত্রবর্ণিত ক্রিয়াগুলির যথাযথ সম্পাদনপূর্বক চিত্তশুদ্ধি হয়ে যাওয়ার পর সেই ক্রিয়াগুলিকে ত্যাগ করে দাও। তারপর শম-দমাদি সাধনার দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির জন্য সৎগুরুর শরণ নাও।'

কিন্তু এর সঙ্গে এই কথাও আছে যে কর্মযোগ পরমাত্ম-প্রাপ্তির স্বতন্ত্র সাধনা। গীতায় ভগবান বলেছেন—

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্।।
যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স পশতি।।*

(৫/৪/৪৫)

*এখানে চতুর্থ শ্লোকের পূর্বার্ধের সম্বন্ধ পঞ্চম শ্লোকের উত্তরার্ধের সঙ্গে রয়েছে এবং চতুর্থ শ্লোকের উত্তরার্ধের সম্বন্ধ পঞ্চম শ্লোকের পূর্বার্ধের সঙ্গে আছে।

'পণ্ডিতজনেরা নয়, অবুঝ লোকেরাই সাংখ্যযোগ এবং কর্মযোগকে ভিন্ন-ভিন্ন ফলদায়ক বলে থাকে। কারণ এই দুটির যেকোনো একটি সাধনাতেও ভালভাবে স্থিত মানুষ দুটির ফলরূপ পরমাত্মাকে পেয়ে যায়। সাংখ্যযোগীদের দ্বারা যে তত্ত্ব প্রাপ্ত হয়ে থাকে, কর্মযোগীদের দ্বারাও সেই তত্ত্বই প্রাপ্ত হয়। সুতরাং যে মানুষ সাংখ্যযোগ এবং কর্মযোগকে (ফলরূপে) এক দেখে, সেই যথার্থ দেখে।'

গীতাতে অনেক জায়গায় কর্মযোগের দ্বারা স্বাধীনভাবে তত্ত্বজ্ঞান, পরমশান্তি, মুক্তি অথবা পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তির কথা আছে। যেমন—

তৎস্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি।।

(৪/৩৮)

'ঐ কর্মযোগী সেই তত্ত্বজ্ঞানকে অবশ্যই নিজের মধ্যে পেয়ে যান।'

যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম নচিরণাধিগচ্ছতি।।

(৫/৬)

'মননশীল কর্মযোগী তাড়াতাড়িই ব্রহ্মকে পেয়ে যান।'

যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে।।

(৪/২৩)

'কেবল যজ্ঞের জন্য কর্ম করেন এমন মানুষদের সকল কর্ম বিলীন হয়ে যায়।'

জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ।। (৪/১৯)

'যাঁর (কর্মযোগী মহাপুরুষের) সকল কর্ম জ্ঞানরূপী আগুনের দ্বারা দগ্ধ হয়েছে তাঁকে জ্ঞানীজনেরাও পণ্ডিত (বুদ্ধিমান) বলে থাকেন।'

যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।

(৫/১২)

'কর্মযোগী কর্মফলকে ত্যাগ করে নৈষ্ঠিক শান্তি প্রাপ্ত হন।'

শ্রীমদ্ভাগবতেও কর্মযোগকে পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তির স্বতন্ত্র সাধনা বলা হয়েছে—

স্বধর্মস্থো যজন্ যজ্ঞৈরনাশীঃকাম উদ্ধব।
ন যাতি স্বর্গনরকৌ যদ্যন্যন্ন সমাচরেৎ।।

(১১/২০/১০)

'যে স্বধর্মে স্থিত থেকে তথা ভোগ-বাসনা ত্যাগ করে নিজের কর্তব্য কর্মের দ্বারা ভগবানের পূজা করে আর সকাম ভাবনা নিয়ে কোনো কর্ম করে না তাকে স্বর্গ বা নরকে যেতে হয় না। অর্থাৎ সে কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়।'

অস্মিঁল্লোকে বর্তমানঃ স্বধর্মস্থোঽনঘঃ শুচিঃ।
জ্ঞানং বিশুদ্ধমাপ্নোতি মদ্ভক্তিং বা যদৃচ্ছয়া।।

(১১/২০/১১)

'স্বধর্মে স্থিত সেই কর্মযোগী এই লোকে সকল কর্তব্যকর্মের আচরণ করতে থেকেও পাপ-পুণ্য থেকে মুক্ত হয়ে বিনা পরিশ্রমে তত্ত্বজ্ঞান অথবা পরমপ্রেম (পরাভক্তি) লাভ করেন।'

তাৎপর্য হলো এই যে কর্মযোগ সাধককে জ্ঞানযোগ অথবা ভক্তিযোগের অধিকারী করে দেয় অথবা আলাদাভাবে কল্যাণও করে দেয়। অন্যভাবে বললে কর্মযোগের দ্বারা সাধনজ্ঞান এবং সাধনভক্তিরও প্রাপ্তি হতে পারে এবং সাধ্যজ্ঞান (তত্ত্বজ্ঞান) এবং সাধ্যভক্তি (পরমপ্রেম অথবা পরাভক্তি)ও লাভ হতে পারে।

কর্মযোগী প্রাপ্ত জিনিসগুলিকে নিজের এবং নিজের জন্য মনে না করে, সংসারের এবং সংসারের জন্য মনে করে সংসারের সেবায় নিয়োজিত করে। এইভাবে প্রাপ্ত জিনিসগুলির (শরীর-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি-অহং) প্রবাহ সংসারের দিকে হয়ে যাওয়ায় জড়তার সঙ্গে তার সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। জড়তার সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হয়ে যাওয়ায় চেতন তত্ত্বই অবশিষ্ট থেকে যায়। অর্থাৎ কর্মযোগী নিজে-নিজেই নিজের মধ্যে (চেতন স্বরূপে) স্থিতির অনুভূতি করে নেয়।—

প্রজহাতি যদা কামান্সর্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে।।

(গীতা ২/৫৫)

'হে পার্থ! যখন সাধক মনোগত সকল কামনা ভালভাবে ত্যাগ করে নিজেই নিজের দ্বারা নিজের মধ্যে সন্তুষ্ট থাকেন, তখন তাঁকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়।'

কর্মযোগের দ্বারা সিদ্ধ মহাপুরুষের নিজেই নিজের মধ্যে স্থিতির অনুভূতি কেমন করে হয়, তার কথা বলেছেন—

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে।।
নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ।।

(গীতা ৩/১৭-১৮)

'যে মানুষ নিজেই নিজের মধ্যে রমণ করে এবং নিজেই নিজের মধ্যে তৃপ্ত এবং নিজেই নিজের মধ্যে সন্তুষ্ট থাকে তার জন্য কোনো কর্তব্য নেই। সেই (কর্মযোগে সিদ্ধ) মহাপুরুষের এই সংসারে না থাকে কোনো কর্ম করার প্রয়োজন, না থাকে কোনো কর্ম না করার কোনো প্রয়োজন এবং সকল প্রাণীর মধ্যে (কোনও প্রাণীর সঙ্গে) তার কিছুমাত্র স্বার্থের সম্বন্ধ থাকে না।'

নিজের মধ্যেই স্থিতির অনুভূতি হওয়ার পর তাঁর প্রকৃতি (গুণ-বিভাগ এবং কর্ম-বিভাগ)-এর সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ (তাদাত্ম্য) মানে ততক্ষণ সে প্রকৃতিজনিত গুণের দ্বারা যেসব ক্রিয়া করা হয়, সেগুলিকে নিজের দ্বারা সম্পাদিত বলে মনে করে—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে।।

(গীতা ৩/২৭)

'সকল কর্ম সর্ব-প্রকারে প্রকৃতির গুণগুলির দ্বারাই করা হয়। কিন্তু অহঙ্কারের দ্বারা মোহিত অন্তঃকরণবিশিষ্ট অজ্ঞানী মানুষ 'আমি কর্তা'—এই রকম মনে করে।'

কিন্তু যিনি গুণ-বিভাগ ও কর্ম-বিভাগকে তত্ত্বগতভাবে জানেন অর্থাৎ যিনি প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করে নিয়েছেন, সেই কর্মযোগী মহাপুরুষ গুণে আসক্ত হন না এবং কর্মেও আসক্ত হন না—

তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে।।

(গীতা ৩/২৮)

'হে মহাবাহো! গুণ-বিভাগ এবং কর্ম-বিভাগকে তত্ত্বগতভাবে জ্ঞাতা মহাপুরুষ 'সকল গুণ গুণের মধ্যেই আচরিত হচ্ছে'—এটি মেনে নিয়ে তাতে আসক্ত হন না।'

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্মস্বনুষজ্জতে।
সর্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে।।

(গীতা ৬/৫)

'যখন মানুষ ইন্দ্রিয়ের ভোগ এবং কর্মের প্রতি আসক্ত থাকে না তখন সেই সকল সম্পর্কের সঙ্গে ত্যাগী মানুষকে যোগারূঢ় বলা হয়।'

❁ ❁ ❁